পাতালে পা

পাতালে পা

শৈবাল মিত্র

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১/৪, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া
১৩৬৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়
শরৎ পাবলিশিং হাউস
৯/৪, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
ফ্যান্সী বাইণ্ডার্স

শ্রীজগৎ লাহা

বন্ধুবরেষু

পাতালে পা

কব্ সে খাড়ি হৈ দরওয়াজা পর

(ইলা অরুণের গান)

মৃত্যু নিয়ে ভাবছিল অরিন্দম। ৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে হায়দরাবাদ থেকে মহারাষ্ট্রের লাতুরে যাচ্ছিল সে। শুধু লাতুরে যাবে না। লাতুর ঘুরে ফেরার পথে ওসমানাবাদ জেলাতে থাকবে দু'দিন। দুটো জেলাতে ভূমিকম্পে ত্রিশ হাজার মানুষ মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে, কেমন আছে, জানতে যাচ্ছে। অরিন্দম সাংবাদিক। মৃত্যু অনেক দেখেছে। বাস, ট্রাম চাপা পড়ে রাস্তায় মানুষ মারা যায়। পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে অহরহ এক-দুজন বিক্ষোভকারী পথেঘাটে মারা পড়ে। পনের দিন আগে সোনারপুরে গণধোলাইয়ে মৃত পাঁচজন ডাকাতকে সে দেখতে গিয়েছিল। পাঁচটা মৃত মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের ডাকাত মনে হয়নি। ছবিসহ তার লেখা খবর পরের দিন সকালে সংবাদপত্রে বেরয়। মৃত্যুর ঘটনা দেখা এবং খবর লেখা তার কাছে জলভাত হয়ে গেছে। সে জেনে গেছে, বেঁচে থাকাটা খবর নয়, খবর হল মৃত্যু। সাদামাঠা, স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, পাঠক পড়তে চায় বেঘোরে মারা পড়ার খবর। একসঙ্গে ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু নিয়ে খবর লেখার সুযোগ সে আগে পায়নি। পূর্ব মহারাষ্ট্রের তিন জেলা জুড়ে কয়েক মিনিটের ভূমিকম্প সেই সুযোগ এনে দিয়েছে।

তাকে ধাঁধায় ফেলেছে মৃত্যুসংখ্যা। ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু সচরাচর হয় না। এক, দুই, পাঁচ, সাত, দশজনের মৃত্যু পর্যন্ত সে ভাবতে পারে। মৃতরা আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত কেউ না হলে, তাদের নিয়ে ভাবতে অসুবিধে হয় না। সে মৃত্যু নৈর্ব্যক্তিক। নৈর্ব্যক্তিক মৃত্যু ঈষৎ বিষন্ন করলেও শোকাতুর করে না, তা নিয়ে অনায়াসে ভাবা যায়, আবেগবিহ্বল সংবাদ লেখা যায়। মৃতের সংখ্যা বেড়ে গেলে তা নৈর্ব্যক্তিক থাকে না। সংখ্যার জোরে ঘাড়ের

ওপর মৃত্যু তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অস্তিত্বের পরতে পরতে বিপদ ছড়িয়ে যায়। ছেলেবেলা থেকে দেখা যাবতীয় মৃত্যু চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। হাওড়া থেকে মাদ্রাজ মেলে ওঠার পর থেকে ত্রিশ হাজার মৃত্যু সংখ্যাটা তাকে পেয়ে বসেছে। মৃত্যুসংখ্যা কি মৃত্যুকে মহিমা দেয়? মানুষের মত মৃত্যু কি অমরত্বলোভী?

জাতীয় সড়ক ধরে ছুটে চলেছে অরিন্দমের সাদা অ্যাম্বাসাডর। চালকসমেত গাড়িটা হায়দরাবাদ থেকে তিনদিনের জন্যে সে ভাড়া করেছে। চালকের নাম মজিদ। ভদ্র, জোয়ান মানুষ, তারই সমবয়সী। তেলেগুভাষী হলেও উর্দু মেশানো হিন্দিতে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। ভূমিকম্পের দু'দিন পরে হায়দরাবাদের তিন সাংবাদিককে নিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুটো জেলা, ওসমানাবাদ, লাতুর ঘুরে এসেছে। সাংবাদিকদের একজন, হায়দরাবাদ ক্রনিকল-এর নাগেশ্বর রেড্ডি, দু'বছর আগেও কলকাতায় এক-ই সংবাদপত্রে তার সহকর্মী ছিল। তিন বছর একসঙ্গে কাজ করেছে দু'জন। মজিদের গাড়ি, নাগেশ্বর-ই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বানজারা হিলে বেসরকারি এক অতিথিসদনে থাকার আয়োজন করে রেখেছিল নাগেশ্বর। কলকাতা থেকে অরিন্দম টেলিফোনে নাগেশ্বরকে যোগাযোগ করে হায়দারাবাদ যাওয়ার খবর পরশুর আগের দিন জানিয়েছিল। হাতে মাত্র দু'দিন সময় পেলেও নাগেশ্বর সব গুছিয়ে রেখেছে। স্টিয়ারিং হুইল ধরে মজিদ বসে আছে। দুর্ঘটনার জায়গাগুলো তার চেনা। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে ঠিকমত পথনির্দেশ করতে পারবে। শহর ছেড়ে জাতীয় সড়কে এসে গাড়ির ক্যাসেটপ্লেয়ার চালিয়ে দিয়েছে মজিদ। গাঁকগাঁক করে বাজছে দেহাতি হিন্দি গান। রাস্তা যত ফাঁকা হচ্ছে, ক্যাসেটের আওয়াজ চড়ছে। কানে তালা লেগে যাচ্ছে অরিন্দমের। চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটছে। চওড়া, মসৃণ রাস্তা। দু-একটা গাড়ি কদাচিৎ চোখে পড়ছে। ত্রাণের জিনিস নিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনীর ট্রাক। অ্যাম্বুলেন্স, পুলিসের জিপ ছুটে চলেছে। ইঞ্জিনে শব্দ নেই, হর্নের তীক্ষ্ন আওয়াজ নেই, গাড়িগুলোও যেন শোকস্তব্ধ! চারটে চাকা হাওয়ায় ভেসে চলেছে। ক্যাসেটে একটা গান শেষ হওয়ার পরে নতুন গান শুরু হওয়ার মুহূর্তে বাতাসের হিসহিস ধ্বনি অরিন্দম শুনতে পেল। মৃদু লয়ে ক্যাসেট বাজালে মজিদের শুনতে অসুবিধে

হত না। কলকাতার অতিথিকে খাতির করতে আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়েছে। কানে যন্ত্রণা করলেও আওয়াজ কমাতে অরিন্দম বলতে পারল না।

রোদে ঝলমল করছে চারপাশ। হেমন্তের নাতিশীতল বাতাস লাগছে গায়ে। রাস্তার দু'ধারে দিগন্তছোঁয়া সূর্যমুখী, জোয়ার আর আখের খেত। পনেরদিন আগে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, নিসর্গে, আকাশে, ফসলের মাঠে তার চিহ্ন নেই। ক্যাসেটে বাজছে ইলা অরুণের সুরেলা, ভাঙা গলার গান, ম্যায় ছপন ছুড়ি মাতোয়ারি।

গানের সুর, কথার মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে অরিন্দম। আগের মতো অস্বস্তি হচ্ছে না। রক্তে মৃদু ঢেউ উঠছে। দুঁদে সাংবাদিক হলেও ভরদুপুরে অরিন্দমের গা ছমছম করছে। বিশাল এক হননক্ষেত্রের দিকে যত এগোচ্ছে, ভয় বাড়ছে। ভাবছে, কীভাবে ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যুর মুখোমুখি হবে? পৃথিবীতে যারা আছে, তাদের চেয়ে যারা নেই, তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো অনেক কঠিন। তার মনের গভীরে নিঃশব্দ সংলাপ শুরু হয়েছে।

জ্ঞান হওয়ার পরে তুমি কবে প্রথম মৃত্যু দেখেছ অরিন্দম?

প্রথম মৃত্যুস্মৃতি মনে করতে চেষ্টা করল অরিন্দম। তখন ন'দশ বছরের বালক। নিরাময়হীন ব্যাধি ধরেছিল তাকে। শয্যাশায়ী ছিল কয়েকমাস। দোতলা বাড়ির দক্ষিণের ঘরে কত দিন, কত রাত আটক থেকেছে, হিসেব নেই। শরীর একটু ভাল থাকলে দক্ষিণের জানালায় গিয়ে বসত। মেঝে পর্যন্ত লম্বা জানালার লোহার শিকে মুখ রেখে বাইরে তাকিয়ে থাকত। ডান দিকে ফুলে ভরা ঝাঁকড়া গোলঞ্চ গাছে কুটো, কাঠি দিয়ে কাক বাসা বানাত, ডিম পাড়ত, ডিম ফুটে বাচ্চা হত, কয়েকদিন খুব চেঁচামেচি করত তারা। মা-বাবার কেউ বাসায় এলে লম্বা গলা তুলে হাঁ করে খেতে চাইত। মাঝে মাঝে অরিন্দমের মনে হত, বাচ্চাদুটো কোকিল নয়ত? জবাব পাওয়ার আগে সুঠাম ডানায় বাসা ছেড়ে তারা চলে যেত। ঘরের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা অরিন্দমের ছিল না। ডাক্তারের বারণ ছিল। আকাশ দেখত অরিন্দম। নীল আকাশে কাজলের রেখার মত উড়ছে কয়েকটা চিল। উড়ছে, না স্থির হয়ে আছে, বুঝতে পারত না। প্রতিবেশী বাড়ির ছাত থেকে বিকেলে যারা ঘুড়ি ওড়াত, তাদের গলা

শুনতে পেত। কেউ বলত, দুয়ো, বাড়েনাক্কো, কেউ চেঁচাত, ভোকাট্টা!

পাশের বাড়ির পল্টুর গলা, কোনো বিকেলে কানে আসত। ঘুড়ি, ওড়ানোর ওস্তাদ ছিল পল্টু। তার ঘুড়ি কেউ কাটতে পারত না। অথচ সে কেটে সাফ করে দিত সবার ঘুড়ি। খোলা জানালার সামনে কেটে যাওয়া একটা চাঁদিয়াল, ময়ূরপঙ্খি, মুখপোড়া বা পেটকাটা ঘুড়ি অসহায়ের মত ভাসতে ভাসতে নামতে থাকলে, সেটা ধরার জন্য নিশপিশ করত অরিন্দমের শরীর। জানালার শিক আঁকড়ে ধরত সে। জানালার বাঁ পাশে সরু গলি। সেখানে গুলি খেলত ছেলেরা। ছেলে মেয়ে মিলে এক্কাদোক্কা খেলত। তাদের কথা, হইচই অরিন্দম শুনতে পেত। লোহার শিক ধরে পরিচিত মুখগুলো দেখার চেষ্টা করত। পল্টু যখন ঘুড়ি ওড়াত, তার দুই যমজ বোন, পান্না আর চুনি গলিতে এক্কাদোক্কা খেলত। তারা ছিল অরিন্দমের সমবয়সী। তাদের সঙ্গে কতবার এক্কাদোক্কা খেলেছে সে। পল্টু ছিল তার চেয়ে চার বছরের বড়। পল্টুদের সঙ্গে পারিবারিক আত্মীয়তা ছিল তাদের। অসুস্থতার সেই সময়টাতে পল্টুদের বাড়িতে হঠাৎ দু-তিন-দিন ব্যস্ততা নজর করল অরিন্দম। পল্টু ঘুড়ি ওড়াচ্ছে না। পান্না, চুনি এক্কাদোক্কা খেলছে না। সরু গলি নিঝুম হয়ে গেলেও পল্টুদের বাড়িতে মানুষের যাতায়াত লেগে থাকল। মাকেও দু-তিনদিন পল্টুদের বাড়িতে সকাল সন্ধে যেতে দেখল অরিন্দম। কারণ জানতে চায়নি। শরীরে অসুখ বাসা বাঁধলে জানার আগ্রহ কমে যায়। এক বিকেলে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখল। খাটে শোয়ানো তের-চোদ্দ বছরের পল্টুকে বাড়ির বাইরে আনা হল। স্কুলের পোশাক পরে আছে পল্টু, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। খাট নিয়ে কয়েকজন বাড়ির বাইরে গলিতে এল। তারপর কাউকে দেখা গেল না। পল্টুকে খাটে তুলে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অরিন্দম বুঝতে পারেনি। রাতে দেখল মায়ের মুখ গম্ভীর। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে তার পাশে মা শুয়ে পড়েছিল। মাকে সে জিজ্ঞেস করল, পল্টুদাকে কোথায় নিয়ে গেল মা?

মা বলল, হাসপাতালে।

অন্ধকারে মায়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মায়ের কথা সে সরল

মনে বিশ্বাস করেছিল। পরের দিন দুপুরে জানালার ধারে বসে সে আকাশ দেখছিল। পল্টুদের বাড়ির দরজা বন্ধ। নিস্তব্ধ বাড়ি। পান্না, চুনির গলার আওয়াজ সকাল থেকে একবারও কানে আসেনি। শেষ দুপুরে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে তিন-চারজন স্কুলের পোশাক পরা ছেলে, পল্টুদের বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত মুখ চাওয়াচাওয়ি করে তাদের একজন ডাকল, প্রত্যূষ!

কেউ সাড়া দিল না। আবার একজন ডাকল। পল্টুর ভাল নাম প্রত্যূষ। কারও সাড়া না পেয়ে বন্ধ দরজায় সন্তর্পণে দু-তিনবার কিল মারল একজন। পাথরের মত নৈঃশব্দ্য ঘুচল না। দু-তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করে তারা চলে যাওয়ার পরমুহূর্তে অরিন্দম বুঝল, পল্টু মারা গেছে। কীভাবে টের পেল? সুতো কাটা গাঢ় লাল রঙের একটা চাঁদিয়াল ঘুড়ি পল্টুদের ছাতের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। কে কাটল ঘুড়িটা? অরিন্দমের এখন মনে হয়, মৃত্যুকে চিনিয়ে দিয়েছিল দুপুরের সেই নৈঃশব্দ্য। সুস্থ হয়ে ওঠার পরে অরিন্দম জেনেছিল, সাতদিনের জ্বরে পৃথিবী ছেড়ে পল্টু চলে গেছে। টাইফয়েড হয়েছিল তার। মৃত্যুর সঙ্গে অরিন্দমের প্রথম পরিচয়, সেখানে থামেনি। মৃত্যুকে তারপর নানাভাবে দেখেছে। বাবা, সোমেশ দত্তর মৃত্যু, আজও ভুলতে পারেনি। টেলিভিশন দেখছিল সোমেশ দত্ত। পাশের ঘরে লেখাপড়া করছিল অরিন্দম। পরের দিন তার এম এ পরীক্ষা শেষ হবে। টেবিলে খাবার সাজিয়ে মা খেতে ডাকল সবাইকে। ছোট বোন রুমকির পরে অরিন্দম গিয়ে চেয়ারে বসল। দুজনের থালায়, ভাতের পাশে গরম তরকারি দিয়ে মা দ্বিতীয়বার বাবাকে ডাকল। দূরদর্শনে খবর শেষ। বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে। খবর আর খেলা ছাড়া কোনও অনুষ্ঠানে যার আগ্রহ ছিল না, সেই সোমেশ দত্ত বিজ্ঞাপন দেখছে! মা অবাক হয়েছিল। খাবার টেবিল ছেড়ে সোফার পাশে গিয়ে সোমেশের কাঁধে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে ডুকরে উঠেছিল। সোমেশের শরীর সোফায় লুটিয়ে পড়েছে। চেয়ার ছেড়ে সোফার কাছে গিয়ে বাবাকে ধরে বসাতে চেষ্টা করেছিল অরিন্দম। পারেনি। বাবা বলে ডেকেছিল কয়েকবার। সাড়া পায়নি। মানুষের ডাকে মৃত্যু সাড়া দেয় না।

অরিন্দমের মনে হয়, জীবন আর মৃত্যু যমজ ভাই-বোন। শিশুর

জন্মের মুহূর্তে এক বিছানায়, তার পাশে, মৃত্যুরও জন্ম হয়। রক্ত-মাংসের শিশুকে দেখা যায়, মৃত্যুকে দেখা যায় না। শিশুটির সঙ্গে সমানে মৃত্যুও বড় হয়। শিশুটির পাশে পাশে থাকে। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খেয়ে পুষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত একটা মুহূর্তও আর অবশিষ্ট থাকে না। দেহের খোলসে তখন পড়ে থাকে নিঃসম্বল একজন মানুষের কাঠামো। মাটি, জল বাতাসের সঙ্গে সে মিশে যায়। জীবনের সামান্য ঘটনাগুলো জুড়ে-জুড়ে যে অনিবার্য দুর্ঘটনা জন্ম নেয়, তার নাম মৃত্যু। খরা, বন্যা, ভূমিকম্পে মৃত্যুর মত প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুও এক দুর্ঘটনা। সেই অর্থে জন্ম আর মৃত্যু দুটোই দুর্ঘটনা! জোড়া দুর্ঘটনার মাঝখানে একটা একমুখো সাঁকো আছে। সাঁকোটার নাম জীবন। ত্রিশ হাজার মৃত্যু মানে, ত্রিশ হাজার সাঁকো ভেঙে পড়া। শেষরাতের ভূমিকম্পে ত্রিশ হাজার সাঁকো ভেঙে পড়েছে। ওসমানাবাদ, লাতুরে যারা মারা গেছে, তাদের অনেকে জানত না, সহোদর মৃত্যুর পাশে আছে। জানার দারকার হয়নি। জীবনধারণের জন্য প্রতি মুহূর্তে যাদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়, অসংখ্য ঘটনার যোগফল যে একটা দুর্ঘটনা, এ চিন্তা তারা করে না। করবে কখন? মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামায় না বলেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

ন'নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গাড়ি চলেছে। ওসমানাবাদ জেলার সীমান্ত দূরে নয়। ভূমিকম্পকবলিত এলাকা যত কাছাকাছি আসছে, অরিন্দমের ভয় বাড়ছে। ভূমিকম্পের খবর পাঠাবার দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা থেকে আসা কতটা ঠিক হয়েছে, ভাবতে শুরু করেছে। তার বাড়িতেও তৈরি হয়েছে ভূমিকম্পের পটভূমি। দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে তার স্ত্রী কৌশিকী। আট মাস চলছে। দিনে-রাতে কয়েকবার কেঁপে উঠছে তার ধবধবে ফর্সা, টানটান চামড়া জড়ানো পরিপূর্ণ কলসির মত শরীরের গর্ভগৃহ। পরশুর আগের রাতেও স্বামীর হাতের পাতা পেটের ওপর চেপে ধরে সেই কম্পন অনুভব করতে বলেছিল কৌশিকী। বলেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

চাপা গলায় কথাটা বলে ঘুমন্ত দোদুলের দিকে তাকিয়েছিল কৌশিকী। ঘরে আলো জ্বলছে। পাঁচবছরের ছেলেটা আবার জেগে না যায়। অরিন্দমের একবার মনে হয়েছিল, ভূমিকম্পের খবর করতে

এখন বাড়ি ছেড়ে যাবে না। মহারাষ্ট্রে যেতে অফিসে অনেকে পা বাড়িয়ে আছে। মুখ থেকে কথাটা খসালেই সে রেহাই পেয়ে যেত। সাতপাঁচ ভেবে বলেনি। দায়িত্ব এড়াতে অস্বস্তি হয়েছিল।

দুপুর দুটোয় অরিন্দম ওসমানাবাদে পেঁাছে গেল। রাস্তার ধারে ত্রাণশিবির। গাড়ি থেকে নেমে ত্রাণশিবিরে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিল। ভ্রমণসূচি-অনুযায়ী লাতুর ঘুরে ফেরার পথে পরশু ওসমানাবাদে থামবে। লাতুরে পেঁাছে টেলিপ্রিণ্টারে রাত দশটার মধ্যে কলকাতায় খবর পাঠাতে হবে। কাল সকালে কাগজে বেরবে সেই খবর। আধঘণ্টার মধ্যে ওসমানাবাদ ছেড়ে লাতুর রওনা হল। ত্রাণশিবির দেখে দমে গেছে অরিন্দম। মনের মধ্যে শুরু হয়েছে একক সংলাপ! তৃতীয় মৃত্যু তুমি কবে দেখেছ অরিন্দম? মৃত্যুর তৃতীয় স্মৃতি কি মনে পড়ে? অরিন্দম জবাব দিচ্ছে না। ক্যাসেটে গান শুনছে সে। গানের আমেজ রক্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাদক সংকেত আছে সুরে। শরীর শিরশির করছে মৃত্যু নিয়ে একক সংলাপের অস্বস্তি মন থেকে সরে যাচ্ছে। দশ কিলোমিটার গিয়ে সূর্যমুখী আর জোয়ারের খেতের মাঝখানে কালো ফিতের মত সড়কের ধার ঘেঁষে গাড়ি রাখল। দামি ক্যামেরা নিয়ে গাড়ির বাইরে এসে খচখচ করে চার-পাঁচটা ছবি তুলল। ছবি আগেও কয়েকবার তুলেছে। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই, কাক কুকুর, নেই টেলিগ্রাফের তারে একটা পাখি বসছে না। শস্যবোঝাই মাঠ খাঁ-খাঁ করছে। অরিন্দমের মনে হল, পায়ের নিচে মাটি দুলে উঠল। পাশে বড় গাছ। গাছের গুঁড়িতে সে হাত রাখল। চালকের আসনে বসে মজিদ দেখছে। নির্বিকার মুখ। মজিদ নিশ্চয় কিছু টের পায়নি। গাছের গুঁড়ি ছুঁয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে অরিন্দম গাড়িতে উঠল। মজিদ স্টার্ট দিল গাড়িতে। শুনশান, ফাঁকা রাস্তা। সামনে ওমরগা তালুক। ওমরগার নাম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার তালিকায় নেই। ঝড়ের গতিতে গাড়ি চলেছে। দূরে একটা গাছ-তলায় দুজন মানুষকে অরিন্দম দেখতে পেল। মাছির মত লাগছে তাদের। গাড়ি কিছুটা এগতে একজন পুরুষ, একজন মহিলার অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারা হাত তুলে অরিন্দমের গাড়ি থামাতে চাইছে! দুজন মানুষের দুটো হাত পাখির ডানার মত নড়ছে। মজিদকে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, ওরা কারা?

ক্যাসেট সামান্য কমিয়ে মজিদ বলল, লাতুর যেতে চায়।

কেন ?

আত্মীয়স্বজনের খোঁজে।

তুলে নাও।

রাস্তায় এরকম লোক অনেক আছে। গাড়িতে জায়গা দিতে পারবেন না।

তবু তুলে নাও।

অচেনা দুজন মানুষের সামনে মজিদ গাড়ি থামাল। দুজনের একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। ক্যাসেটে বাজছে ইলা অরুণের গানের কলি, সুর্মা লাগাকে কব্‌ সে খাড়ি হৈ দরওয়াজা পর।

সাতাশ-আটাশ বছরের মেয়েটার দিকে অরিন্দম তাকাল। চোখের তলায় শুকনো জলের দাগ। গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে অরিন্দম মুখ বার করতে ভাঙা হিন্দিতে পুরুষ জিজ্ঞেস করল, লাতুর যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

আমাদের পৌঁছে দেবেন লাতুরে ?

আপনাদের পরিচয় ?

আমার নাম ভেঙ্কট নাভালকর। এ আমার বোন মুরলি।

দুজনকে ভাল করে দেখল অরিন্দম। কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের মত চেহারা, পোশাকআশাক। মুখ দেখে সন্দেহ করার কিছু নেই। ভেঙ্কটের বয়স চল্লিশের বেশি নয়। গাড়ির দরজা খুলল না অরিন্দম। জানালায় মুখ রেখে জিজ্ঞেস করল, লাতুরে কেন যেতে চান ?

লাতুরের কিলারি তালুকে আমার দিদির বাড়ি। তাদের খোঁজ করতে যাচ্ছি।

হিন্দি ভাষা ভেঙ্কট ভাল জানে না। কী হতে পারে তার মাতৃভাষা ? অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকার মাতৃভাষা সম্পর্কে অরিন্দমের ধারণা নেই। তিনটে ভাষার কোনওটা সে জানে না। মারাঠি, অল্পসল্প বুঝতে পারলেও তেলগু, কানাড়ি দুর্বোধ্য। লম্বাটে মুখ, ছিপছিপে শরীর মুরলিকে সে দেখছে। দুচোখের চকচকে মণি তুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে মুরলি। দৃষ্টিতে গভীর প্রত্যাশা। মুরলির মুখের সঙ্গে তার সহোদর, চৌকো মুখ

ভেংকটের মিল নেই। তবু কোথাও মিল আছে। দুর্যোগের ছায়া লেগে দুটো মুখের আদল অনেকটা একরকম হয়ে গেছে। ভাঙা হিন্দিতে ভেংকটের কথাগুলো বুঝতে অরিন্দমের অসুবিধে হল না। গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় নেমে সে বলল, আসুন।

হাতের ইশারায় পেছনের আসনে দুজনকে উঠতে বলল। ভেংকট বলল, আমরা সামনে বসছি।

দরকার কি ? পেছনে বসুন।

গাড়ির পেছনে আনে মুরলিকে তুলে দিয়ে সামনের দরজা খুলে মজিদের পাশে ভেংকট বসল। ঘটনাটা এত আচমকা ঘটল, অরিন্দম মুখ খোলার সুযোগ পেল না। গাড়িতে উঠে নিজের জায়গায় বসল। দরজা বন্ধ করল।

গাড়ি চলছে। চালু হয়েছে ক্যাসেটে গান। এককোণে জবুথবু হয়ে মুরলি বসেছে। অচেনা পুরুষের পাশে সম্ভবত প্রথম বসল। দিদি আর তার পরিবারের জন্যে দুশ্চিন্তায় বেঁকে গেছে মুরলির ঘাড়। অরিন্দমের দিকে তাকাচ্ছে না। অরিন্দমের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইছে ভেংকট। মুরলি চুপ। ভেংকটের কথার টুকরো জুড়ে দুই অতিথির পরিচয় খুঁজছে অরিন্দম। মন দিয়ে ভেংকটের কথা শুনছে। খবর লিখতে তথ্য লাগে। মানবিক উপকরণ ছাড়া খবর হয় না। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মাঠ, মাটি, লোকালয় দেখার সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে। চোখের দেখা, সব ঠিক নয়। কানে শোনা বিবরণও তাই। তাহলে ? ভেংকটের কথা থেকে মুরলির নীরবতার কারণ জেনে গেল অরিন্দম। শুধু ভাষার কারণে মুরলি চুপ করে নেই। ভয়ে সে বোবা হয়ে গেছে। কিলারিতে মুরলি যাচ্ছে তার ছেলের খোঁজে। ছেলের নাম কেশব। মাসির বাড়িতে যাওয়ার জন্যে আট বছরের ছেলেটা এমন বায়না ধরেছিল যে না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। কিলারিতে কেশবকে পাঠানোর খবর স্বামী সদাশিব দেশপাণ্ডেকে মুরলি জানায়নি। যে কোনদিন বাড়ি চলে আসবে সদাশিব। অথচ কেশব বাড়ি ফেরেনি। ভেংকটকে থামিয়ে মুরলিকে অরিন্দম জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার স্বামী কোথায় ?

হিন্দিতে করা প্রশ্নটা মুরলি প্রথমে বুঝল না। অরিন্দম আবার

বলতে বুঝল। বলল, সোলাপুরে।

কী করেন সেখানে?

চাকরি।

জবাব দিয়ে মুরলি নিজেই মুখ খুলল। প্রশ্ন করল, ছেলেকে খুঁজে পাব তো?

মুরলির প্রশ্নের জবাব অরিন্দমের জানা নেই। পাশ কাটানো জবাব দিল, আমরা তো সেখানেই যাচ্ছি।

কথাটা বলে অন্যমনস্ক হল। ভূমিকম্পে ত্রিশ হাজার মানুষ মারা গেছে, মুরলি কি জানে না? ভেঙ্কটের জানার কথা। নিশ্চয় জানে। মৃত ত্রিশ হাজারের মধ্যে কেশব নামে আট বছরের এক বালক থাকতে পারে। মুরলির সঙ্গে দেখা না হলে তার ছেলে কেশব, মৃত ত্রিশ হাজারের একজন হয়ে যেত। পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সংখ্যা ভেঙে বেরিয়ে আসছে মানুষের মুখ। ভূমিকম্পের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় বসে অরিন্দম জেনেছিল, শ্মশান হয়ে গেছে কিলারি। আশি শতাংশ বাড়ি মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শুধু কিলারিতে মৃতের সংখ্যা চোদ্দ হাজার। মুরলির কাছে কি এসব খবর পৌঁছয়নি? হয়ত পৌঁছেছে। বিমূর্ত সংখ্যাটা তার মনে দাগ কাটেনি। কিলারিতে মৃত চোদ্দ হাজার মানুষের চেয়ে জলজ্যান্ত ছেলের চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ছেলে ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারছে না। অরিন্দমের মনে হল, তার কথায় মুরলি কিছুটা ভরসা পেয়েছে। তার দু'চোখের কালো মণিতে খুশির আভা। ভরসা করার মত কথা মুরলিকে অরিন্দম বলেনি। তবু মানুষ, কি কথা থেকে কখন ভরসা পায়, কেউ জানে না। ভাষার মজা এখানে। যে বলে, আর যে শোনে, দু'পক্ষই ভাবে তাদের বলা বা শোনায় ভুল হয়নি। অথচ বোঝাবুঝিতে তফাত ঘটে যায়। মুরলির দিদির বাড়ি পাথরে তৈরি কিনা, জিজ্ঞেস করতে গিয়ে অরিন্দম চুপ করে গেল। বেশিরভাগ পাথরের বাড়ি মাটির তলায় চলে গেছে, এ খবর সে জানে। মাটির বাড়ি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ভেঙ্কট কথা বলে চলেছে। বাড়িতে মুরলির দু'বছরের একটা মেয়ে আছে। পাশের গ্রামে মা-বাবার কাছে মেয়েকে রেখে এসেছে। ভূমিকম্প-কবলিত আর এক তালুক, পেটসাংভিতে থাকে তাদের বড়

বোন পার্বতী। পার্বতীর তিন ছেলেমেয়ে। স্বামী ছাড়া বাড়িতে আছে শ্বশুর, শাশুড়ি, দুই দেওর, এক ননদ। কিলারি থেকে কেশবকে নিয়ে তারা পেটসাংভি যাবে। দিদির খবর না নিয়ে কী করে বাড়ি ফেরে! পেটসাংভি নামটা অরিন্দমের চেনা। তার ভ্রমণসূচিতে আছে। সেখানে কাল অথবা পরশু যাবে। ক্ষয়ক্ষতি সেখানে কম হয়নি। কথাটা সে বলতে পারল না। ক্যাসেটে বাজছে ইলা অরুণের গান, মেরা যোবন হালে দোলে।

ভিজে মাটি থেকে উঠে আসা বাষ্পের মতো গানের সুরটা অরিন্দমের চেনা লাগে। ভূমিকম্পের আবহ বদলে দিতে থাকে গানের সুর। ঝিমধরা নেশার মতো অনুভূতি মগজে ছড়িয়ে পড়ে। তেরচা চোখে অরিন্দম দেখে মুরলিও গান শুনছে। তার বসার ভঙ্গি এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছে। হলুদ রঙের নাইলন শাড়ি পরেছে সে। হলুদ জমিতে হালকা খয়েরি ফুল। সূর্যমুখীর রঙের আভাস আছে শাড়িতে। শাড়ির আঁচল যত্ন করে কখন একসময় কাঁধের ওপর গুছিয়ে নিয়েছে। তার শুকনো মুখে ধীরে ধীরে প্রাণের আভা ফিরে আসছে। গান শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। বাঁ নাকের পাটায় লাল পাথর লাগানো সোনার নাকছাবি চকচক করছে। কিলারির দশ কিলোমিটার আগে গাড়ির গতি কমিয়ে মজিদ বলল, সামনে পেটসাংভি।

কিলারির আগে পেটসাংভি পড়বে, অরিন্দম জানত না। ভেংকটকে বলল, আপনারা চাইলে পেটসাংভি ঘুরে কিলারি যেতে পারি। যাবেন দিদির বাড়ি?

প্রশ্ন শুনে উজ্জ্বল হল মুরলির মুখ। ভেংকট গা করল না। বলল, কিলারি থেকে কেশবকে নিয়ে পার্বতীর বাড়ি যাব।

ভেংকট বুদ্ধিমান। পেটের ছেলেকে না দেখা পর্যন্ত কোথাও গিয়ে মুরলি শান্তি পাবে না, সে জানে। দিদির চেয়ে ছোট বোনের ওপর ভেংকটের বেশি মমতা। অরিন্দম কথা বাড়াল না। কিলারি পৌঁছতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। কিলারি থেকে লাতুর এক ঘণ্টার পথ। সময়ের হিসেব করে নিল অরিন্দম। ছ'টার মধ্যে লাতুর না পৌঁছলে কলকাতায় খবর পাঠানো যাবে না। টেলিফোন, টেলিপ্রিণ্টারে বিকেল থেকে সাংবাদিকদের লাইন পড়ছে। ভিড় কমতে রাত ন'টা বেজে যায়। হায়দরাবাদে নাগেশ্বরের কাছে এসব খবর অরিন্দম শুনেছে।

দুই

ম্যায় ঝমঝুম নাচো

(ইলা অরুণের গান)

জাতীয় সড়কের ধারে ত্রাণশিবিরে ঢোকার আগে রাস্তার চা-দোকানে চা খেতে দাঁড়াল অরিন্দম। চা দোকানের উল্টোদিকে মাঠের ওপরে তাঁবু ফেলে অস্থায়ী ত্রাণশিবির, হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। চা দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চিতে তিনজন বসল। অরিন্দমের সঙ্গে সামান্য দূরত্ব রেখে বসেছে ভেঙ্কট আর মুরলি। চারকোনা প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে কলা, বিস্কুট বার করে অরিন্দমকে মুরলি বলল, খান।

কথাটা মুখে না বললেও দেওয়ার ভঙ্গিতে জানাল। মুরলির হাত থেকে একটা বিস্কুট নিল অরিন্দম। কলা হাতে নিয়ে মুরলি বসে আছে। অরিন্দমকে ভেঙ্কট বলল, খান।

অরিন্দম বলল, বিস্কুট যথেষ্ট। আপনারা খান।

চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল অরিন্দম। ইট বাঁধানো রাস্তা কিলারি গ্রামের দিকে চলে গেছে। ফাঁকা রাস্তা। দূরে, নিস্তব্ধ কিলারি তালুক। অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে একটা তালুক। তালুকের নামকরণ করা হয় সবচেয়ে বড় গ্রামের নামে। ইটের রাস্তার দু'পাশে মাঠের পর মাঠ জুড়ে সূর্যমুখী ফুটে আছে। হলুদের ঢেউ আকাশ ছুঁয়েছে। মাঝে মাঝে আখক্ষেত। সরস, পুষ্ট আখের সবুজ পাতা হাওয়ায় দুলছে। কিলারিতে আজ সে ঢুকবে না। ত্রাণশিবির, হাসপাতাল ঘুরে সন্ধেতে প্রথম খবর কলকাতায় পাঠাবে। কিলারি আসবে কাল সূর্য ওঠার আগে লাতুর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। ভূমিকম্পে তলিয়ে যাওয়া গ্রামগুলো সারা সকাল, দরকার হলে দুপুর, বিকেল পর্যন্ত দেখবে। চায়ের গ্লাস হাতে গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকল অরিন্দম। কিলারি গ্রাম ছেড়ে কয়েক কিলোমিটার দূরে কোউটি নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে সদাশিব দেশপাণ্ডের বাড়িতে ছেলে কেশবকে খুঁজতে যাচ্ছে মুরলি। ভেঙ্কট পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চৌকো

মুখ ভেঙ্কটকে আড়চোখে অরিন্দম দেখল। নীল ট্রাউজার্স, হলুদ টি-শার্ট, পায়ে স্ট্র্যাপ লাগানো জুতো, নিরীহ মুখ, দোহারা চেহারা মানুষটা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর সে জেনে গেছে। কিল্লারি, পেটসাংভিতে যাদের খোঁজে সে এসেছে, তারা কেউ নেই, তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না, সব সে জানে। মুরলি জানে না। ভেঙ্কট বলেনি মুরলিকে। কেন বলেনি? মুরলির সামনে থেকে মৃত্যুকে কি আড়াল করতে চাইছে? চাইতে পারে। সব জেনেও মুরলির মত ভাবছে, আত্মীয়রা বেঁচে আছে। ভূমিকম্পে পৃথিবী তলিয়ে গেলেও তার প্রিয়জনদের ক্ষতি হয়নি। গ্লাসের তলানি চা রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে অরিন্দম বলল, ত্রাণশিবিরের অফিসে ঘুরে, হাসপাতাল দেখে, আমি লাতুর যাব। আপনারা কী করবেন?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ভেঙ্কট। মুরলি পাশে এসে দাঁড়াল। অরিন্দমের কথাটা তাকে শোনাল ভেঙ্কট। ভাষাটা সম্ভবত তেলুগু। মুরলি যা বলল, ভেঙ্কট শোনাল অরিন্দমকে। তার সঙ্গে অফিসে, হাসপাতালে মুরলিও যেতে চায়। অরিন্দম আপত্তি করল না। চা দোকানে গ্লাস দিয়ে দাম মেটাতে মানিব্যাগ বার করল। ভেঙ্কট বলল, চায়ের দাম দিয়ে দিয়েছি।

রাস্তায় গিজগিজ করছে মানুষ। গাড়ি কম জমেনি। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজে যারা এসেছে, তাদের চেনা যায়। সংখ্যায় তারা বেশি। তারা হাসপাতালের চারপাশে ভিড় করেছে। ত্রাণের কাজে ব্যস্ত সরকারি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছে অনেকে। ত্রাণশিবিরের দপ্তরে ঢুকল অরিন্দম। পেছনে ভেঙ্কট, মুরলি। শিবিরের কর্তা, কিল্লারির সরপঞ্চ, পাডসালগির সামনে একটা চেয়ারে অরিন্দম বসল। কাঠের ফ্রেম লাগিয়ে তৈরি অস্থায়ী দপ্তর। দপ্তরে দরজা নেই। দরজার ফ্রেমে পর্দা ঝুলছে। ভেঙ্কট, মুরলিকে দরজা আগলে দাঁড়ানো পাডসালগির দুই সহকর্মী থামিয়ে দিয়েছিল।

অরিন্দম বলতে দুজনকে ভেতরে ঢুকতে দিল। পাডসালগির সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলল অরিন্দম। নোটবুকে লিখে নিল কিছু তথ্য। ষাটের কাছাকাছি বয়স, রোগা, ছোটখাটো মানুষটার কথা

বলতে কষ্ট হচ্ছে। চশমা নেমে এসেছে নাকের কাছে। ঘাম জমছে কপালে। পাড়সালগির কাছে কোউটি গ্রামের বোন, ভগ্নীপতির পরিবারের খবর জানতে চাইল ভেংকট। টাইপ করা দু-তিনটে নামের তালিকা খুঁজে পাড়সালগি বলল, খাতায় নাম নেই। হাসপাতালে খোঁজ করুন। লাতুরের হাসপাতালেও খোঁজ নেবেন। দপ্তরে লোক আসার কামাই নেই। আত্মীয়স্বজনের খবর নিচ্ছে কেউ, কেউ আবেদনপত্র জমা করছে। শান্তভাবে কথা বলছে পাড়সালগি। অরিন্দম চেয়ার ছেড়ে ওঠার মুহূর্তে ষাট বছরের মানুষটা হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, আমার চেনা কেউ-ই প্রায় বেঁচে নেই পত্রকারসাব।

দমকা হাওয়ায় পাড়সালগির টেবিলে ছড়ানো কিছু কাগজ উড়ে গেল। কাগজের ওপর থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ল পাড়সালগির কলম। ছেলেবেলার এক ঘটনা অরিন্দমের মনে পড়ল। মাঝদুপুরে কয়েকজন ছেলে একটা বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক সহপাঠীর নাম ধরে ডাকছে। সহপাঠীর নাম প্রত্যুষ। কয়েকবার তারা ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। সেই নিস্তব্ধ দুপুরে জীবনের প্রথম মৃত্যুসংবাদ যেভাবে পেয়েছিল, পাড়সালগির কান্না থেকে সেভাবে আর একটা মৃত্যুর খবর জানতে পারল। মুরলির ছেলে কেশবকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে নেই। ধুতির খুঁটে চোখ মুছছে পাড়সালগি। ভেংকট থতমত খেয়ে গেছে! এক পোঁচ কালি কেউ বুলিয়ে দিল মুরলির মুখে। চোখ মুছে পাড়সালগি সামলে নিল নিজেকে। বলল, এ বছর সূর্যমুখী, আখ আর জোয়ারে খেত ভরে গেছে। ফসল পেকে উঠছে। কাটার লোক নেই। রোজ সন্ধেতে বৃষ্টি হচ্ছে। এরকম চললে পাকা ফসল খেতে পচে যাবে।

এক মুহূর্ত থেমে যোগ করল, চাপা পড়া মানুষের শরীর মাটির তলাতে ক্রমশ নেমে যাবে। তাদের আমরা আর তুলে আনতে পারব না।

পাড়সালগির দু চোখ জলে ভরে উঠছে। দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে এসে অরিন্দম ঘড়ি দেখল। অল্প দূরে অস্থায়ী হাসপাতাল। হাসপাতালে আজ না গেলেও অসুবিধে নেই। কাল সকালে

কিলারিতে ঢোকার আগে হাসপাতাল ঘুরে যাবে। পাড়সালগির কাছে যা খবর পেয়েছে, কলকাতায় পাঠানোর পক্ষে কম নয়। ত্রাণ-শিবিরের দরজায় এসে দেখল মুরলি, ভেংকট দাঁড়িয়ে আছে। পাড়সালগির কথা শুনে মুরলি দমে গেছে। জলে টলটল করছে দুচোখ। শ্যামলা, ছিপছিপে মেয়েটার জন্য অরিন্দমের মায়া হল। বলল, হাসপাতাল ঘুরে আপনারা দেখুন। আমি লাতুর যাচ্ছি। কাল সকালে এখানে আবার আসব। আপনারা থাকলে দেখা হবে।

অরিন্দমের কথা শুনে ভেংকটের দিকে তাকাল মুরলি। কাঁচু-মাচু মুখে ভেংকট বলল, বাবুজি, লাতুরে আমাদেরও যেতে হবে।

চলুন।

দেরি করতে চাইছে না অরিন্দম। মুরলি বলল, হাসপাতাল না দেখে চলে যাব?

তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। বিব্রত বোধ করল অরিন্দম। ভাল করে দেখল মুরলিকে। সারাদিন রোদে পুড়লেও লাবণ্যে টলটল করছে শরীর। মাতৃত্বের আলাদা লাবণ্য আছে। অবিবাহিতা মেয়ের শরীরে তা থাকে না। তার সৌন্দর্য অন্যরকম। গাড়ির দিকে অরিন্দম পা বাড়াতে মুরলি বলল, আমরাও যাব।

সায় দিল ভেংকট, লাতুরের হাসপাতালে কেশবকে পেয়ে গেলে কাল সকালে বাবুজির সঙ্গে এখানে আসব। কিলারি, পেটসাংভির আত্মীয়দের খবরও তো নিতে হবে। হাসপাতালটা শুধু এক চক্কর দেখে আসি।

'না' বলতে পারল না অরিন্দম। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া দুই সহযাত্রীকে ফেলে একা চলে যেতে অস্বস্তি হল। মুরলি, ভেংকটের সঙ্গে হাসপাতালের ভেতরে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে সে-ও পা বাড়াল। সামরিক ছাউনির মত বড় বড় তাঁবু ফেলে হাসপাতাল বানানো হয়েছে। হাসপাতাল না বলে সেবাকেন্দ্র বলা ভাল। জখম রুগীর সংখ্যা বেশি। প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিচর্যা করা ছাড়া আর কিছুর ব্যবস্থা নেই। অপারেশন, কাটাছেঁড়া, রোগ নিরাময়ের জন্যে রুগীকে লাতুর হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। কিলারি হাসপাতালে ঢুকে দুর্ঘটনার ভয়াবহ চেহারা অরিন্দম খানিকটা বুঝতে পারল। সারি সারি দড়ির খাটিয়া পেতে অস্থায়ী হাসপাতাল

বানানো হয়েছে। নেয়ারের খাটও রয়েছে। মেঝেতে চট পেতে শুয়ে আছে কয়েকশ মানুষ। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কেউ। ভাঙা হাতে প্লাস্টার বেঁধে চারপাই-এর ওপর উদাস মুখে একজন বসে আছে। মুরলি, ভেংকট যখন প্রতিটা বিছানার সামনে গিয়ে কেশবকে খুঁজছে, আহত এক বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা শুরু করে দিয়েছে অরিন্দম। সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়স, মানুষটার নাম ধনরাজ কোনে। অরিন্দমের পরিচয় জেনে ধনরাজের কাছে তাকে নিয়ে এসেছে এক নার্স। তলনিতে ধনরাজের বাড়ি। নার্স বলল, ধনরাজের পরিবারের চোদ্দজন ভূমিকম্পের রাতে মারা গেছে। বেঁচে আছে ধনরাজ একা। ধনরাজের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের বুক ধড়ফড় করছে। পনেরোদিন আগে পরিবারের সবাইকে যে হারিয়েছে, তার সঙ্গে কী কথা সে বলবে? কিন্তু কথা না বলে উপায় নেই। তলনিতে যার বাড়ি, তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। গ্রামটা তার চেনা। কাগজে নামটা পড়েছে। ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া নালোার মধ্যে তলনির নাম পেয়ে ভ্রমণসূচিতে তলনিকে রেখেছিল। নাগেশ্বরও তলনিতে যেতে বলেছে। অরিন্দম ঘামছিল। ফাঁকা চোখে তাকে দেখছে ধনরাজ। ফাঁকা তো বটেই। ধনরাজকে যারা বাবা বলে ডাকত, তারা নেই। তাকে দেখলে ঘোমটা টানত যারা, সেই বৌ, পুত্রবধূরা নেই। তাকে কেউ দাদু, জ্যাঠা, কাকা বলবে না। ধনরাজ কোনে নামে যারা তাকে চিনত, তাদের বেশির-ভাগ মারা গেছে। সবরকম সম্পর্ক, পরিচয়ে বিজড়িত মানুষটা, রাতারাতি একা হয়ে গেছে। ধনরাজকে দেখে অরিন্দমের মনে হচ্ছিল, আকাশ ফাটিয়ে লোকটা এখনই চিৎকার করে উঠতে পারে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ধনরাজের বিছানার পাশে অরিন্দম দাঁড়িয়ে আছে। ধনরাজকে নিয়ে আজ সন্ধেতে কলকাতায় খবর পাঠানো যায়। ধনরাজের একটা ছবি তোলার কথা মনে এলেও ক্যামেরা তাক করতে সঙ্কোচ হচ্ছে। ধনরাজ জিজ্ঞেস করল, আপনি পত্রকার?

হ্যাঁ। কলকাতা থেকে এসেছি।

ধনরাজের শান্ত গলা শুনে অরিন্দম ভরসা পেল। লোকটা পাগল হয়ে যায়নি। পাথরও নয়। অরিন্দম জিজ্ঞেস করল,

তলানিতে আপনার বাড়ি ?

হ্যাঁ।

খুচরো কিছু কথার পরে ধনরাজ মুখ খুলল। ভূমিকম্পে সর্বস্ব-হারানো একজন মানুষের মুখ থেকে অরিন্দম প্রথম শুনল, দুর্ঘটনার রাতের বিবরণ। অন্ধকার রাতে আকাশ ভেঙে পড়ার কাহিনী শোনাচ্ছে ধনরাজ। ভূমিকম্পের আগের দিন সকাল থেকে ধনরাজ টের পেয়েছিল, অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে। ভোররাতে বিছানা থেকে উঠে লোটা ভর্তি জল নিয়ে মুখ ধুতে বসেছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তখনই মনে হয়েছিল, রাত কিছুতে শেষ হচ্ছে না। বৃষ্টি হচ্ছিল কয়েকদিন ধরে। মেঘলা ছিল আকাশ। সেই সকালেও আকাশে মেঘ ছিল। ধনরাজের মনে হয়েছিল, শুধু মেঘের জন্যে আকাশ অন্ধকার নয়, রাত না ফুরনোর অন্ধকারও নয়, অন্যরকম অন্ধকার। পাতাল থেকে কালো ধোঁয়া উঠে এলে এমন অন্ধকার দেখা যায়। তুমুল বৃষ্টির পরেও মেঘ কাটছিল না। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ঘুমের মধ্যে বারবার চমকে উঠেছে। ঘুম ভেঙে গেছে। দাঁতন করতে বসে ক্লান্ত লাগছিল, ভারি হয়েছিল মন। বেলা বাড়লেও অস্বস্তি কাটল না। গাঁয়ের লোকজনকে মনমরা দেখাচ্ছিল। হোলকারদের মেটে রঙের দুধেল গরুটা দড়ি ছিঁড়ে পাগলের মত ছোটাছুটি করছিল। তাকে ধরতে রাস্তায় নেমে পড়েছিল হোলকার পরিবারের সবাই। ধনরাজের স্ত্রীর সকাল থেকে গা গুলোচ্ছিল। স্ত্রীর জন্যে গ্রামের ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে বেরিয়ে ধনরাজ টের পেল, তারও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কথাটা কাউকে বলেনি। ডাক্তারকেও নয়। বাড়ি ফিরে দেখল, নাতিপুতিরা খেতে বসেছে। খাওয়ায় তাদের রুচি নেই। খেতে বসে রোজ যারা হইচই করে, ঝামেলা করে, আজ কিছুই করছে না—চারপাশে নানা কুলক্ষণ দেখেও বুঝিনি, সেটাই ছিল শেষদিন। কথাটা কাউকে বলিনি। শুনে সবাই হাসবে। গণপতি উৎসবের সেটা ছিল শেষদিন। খেতে, শুতে রাত হয়েছিল। ভাল করে খেতে পারিনি। মুখে স্বাদ ছিল না। ভেবেছিলাম, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ব। ঘুম আসছিল না। সন্ধের পর বৃষ্টি হলেও গুমোট কাটেনি। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলাম। শ্বাসকষ্ট

বাড়ছিল। পাহাড় ভাঙার গমগমে শব্দ শুনেছিলাম ক'দিন ধরে। শব্দটা সবাই শুনেছে। পাড়ার ছেলেরা বলেছিল, কাছেই যে তারণা প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, শব্দ আসছে সেখান থেকে। বারুদ দিয়ে মাঝেমাঝে সেখানে পাহাড় ফাটানো হয়। আমিও বিশ্বাস করেছিলাম তাদের কথা। ভূমিকম্পের আগে মাটির তলা থেকে আওয়াজ ওঠে, আমি জানতাম। সত্তর বছর বয়স হল আমার। পাঁচটা ভূমিকম্প দেখেছি। আওয়াজটা আগে শুনেছি। তবু চিনতে পারলাম না।

কথা শেষ করে সামনের বিছানার দিকে ধনরাজ এগিয়ে গেল। ছ-সাত মাসের এক শিশুকে সেখানে বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছে সাদা পোশাক এক নার্স। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে শিশুটার মুখের দিকে ধনরাজ তাকিয়ে থাকল। ধনরাজের চোখে জল। অরিন্দমকে বলল, আমার মত এই বাচ্চাটাও সবাইকে হারিয়েছে। মা-বাবার মুখ কখনও মনে করতে পারবে না।

শুকনো মুখে মুরলি এসে দাঁড়াল অরিন্দমের পাশে। ত্রাণশিবিরে কেশবকে পায়নি। হাসপাতালেও কেশব নেই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ভেঙ্কট। সে এল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সে কিছু ভাবছে। তার কপালের রেখা চিন্তায় গভীর হয়েছে। অরিন্দমের সঙ্গে তারা চুপচাপ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। অরিন্দম কোনও প্রশ্ন করল না।গাড়িতে গিয়ে উঠল। রাস্তার উল্টোদিকে সূর্যমুখীর বিশাল খেতের শেষে সবুজ রেখার মত দেখা যাচ্ছে কিলারি তালুক। গাড়িতে ওঠার আগে সেদিকে মুরলি তাকিয়ে আছে। কিলারির কোর্উটি গ্রামে, দিদির বাড়িতে তার ছেলে কেশব আছে। সেখানে গেলে কেশবকে পেয়ে যাবে।

এতদূরে এসে ছেলেকে না নিয়ে লাতুরে যেতে পা উঠছে না। সব বুঝেও অরিন্দম চুপ। মুরলি, ভেঙ্কটকে এড়াতে চাইছে। কেশবের খোঁজে তারা কিলারি গেলে সে খুশি হয়। নিজের মত সে চলাফেরা করতে পারে। লাতুর থেকে কলকাতায় খবর পাঠানো ছাড়া আরও একটা কাজ আছে। কম দরকারি নয় সেটা। কৌশিকীকে ফোন করতে হবে। কথা দিয়ে এসেছে, রোজ রাতে একবার ফোন করবে। ফোন না পেলে, রাতে কৌশিকী ঘুমোতে

পারবে না। ঘর-বার করবে। দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়বে। শরীরের এই অবস্থায় যতটা সম্ভব, তাকে শান্তিতে রাখা উচিত। টেলিফোন করার সুযোগ হাতের কাছে পেলে, সে কথা রাখবে। রোজ রাতে কৌশিকীকে ফোন করবে। কৌশিকীকে নিয়ে তারও দুশ্চিন্তা কম নয়। কৌশিকীর গর্ভে তার সন্তান আছে। পৃথিবীতে আসতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাতৃগর্ভ থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়। ত্রাণশিবিরের পাশে ফাঁকা মাঠে আরও কয়েকটা গাড়ি রয়েছে। গাড়ির ডানদিকের দরজা খুলে মুরলিকে অরিন্দম বলল, উঠুন।

ভেঙ্কটের দিকে মুরলি তাকাল। সামনে দরজা খুলে ভেঙ্কট গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে মুরলি বলল, আমি দিদির বাড়ি যাব।

কথাটা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ভেঙ্কটের মুখ। সে যেতে চায় লাতুরে। মূল ত্রাণশিবির সেখানে। দিদির পরিবারের সঠিক হদিস তারা দিতে পারবে। মুরলিকে বুঝিয়ে রাজি করাতে চাইল সে। কিলারি তালুকের কোনও গ্রামে এই মুহূর্তে মানুষ নেই। কোউটি গ্রামের সব বাড়ি জনমানবহীন। পাডসালগি, কথাটা এখনই বলেছে। মুরলিও শুনেছে। কিলারির বাসিন্দাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, তাদের বড় অংশ লাতুর ত্রাণ-শিবিরে জায়গা পেয়েছে। কেশবকে সেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জীবিত গ্রামবাসীদের অনেকে ত্রাণশিবিরে, কেউ কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের ঠিকানা ত্রাণশিবিরে নেই। কেশবকে নিয়ে মুরলির দিদি সেরকম কোনও আশ্রয়ে গেলে, সে খবর ত্রাণ শিবির জানে না। কেশবের মা-বাবার সঙ্গে দিদি নিজে যোগাযোগ করবে। উল্টো ঘটনাও আছে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে এমন কিছু মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, যাদের পরিচয় জানা যায়নি। কিলারিতে আত্মীয় বাড়িতে তারা এসেছিল। প্রতিবেশী কেউ কেউ হয়ত এই কুটুমকে চিনত। তারা বেঁচে নেই। পরিচয় জানার আগেই এরকম অসংখ্য মৃতদেহ গণচিতায় ছাই হয়ে গেছে। তাদের ছবি তুলে রাখা যায়নি। ভেঙ্কটের মুখ দেখে অরিন্দম টের পেল, কিলারিতে সে যেতে চায় না। মুরলির যাওয়া ঠেকাতে চায়। তাহলে মুরলির সঙ্গে সে এল কেন? মুরলিকে কেন আসতে দিল? অরিন্দমের সন্দেহ হল স্বজন হারানোর খবর ভেঙ্কট আগে

থেকে জানে। অবুঝ ছোটবোনকে শান্ত রাখতে তার সঙ্গে এসেছে। ভগ্নীপতি, সদাশিব দেশপাণ্ডে যে কোনওদিন বাড়িতে ফিরবে। কেশবকে বাড়িতে না দেখলে সদাশিব দারুণ অশান্তি করবে। সদাশিব নিশ্চয় রগচটা লোক। মুরলি তাকে ভয় পায়। ভেঙ্কটকে দেখে অরিন্দম বুঝেছে তাদের পরিবারের সবাই সমীহ করে সদাশিবকে। সদাশিবের ক্রোধ থেকে বাঁচতে মুরলির সঙ্গী না হয়ে ভেঙ্কটের উপায় ছিল না। মুরলিকে আগলে রাখতে তার সঙ্গে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েছে। মুরলির পাশে এখন তার থাকা উচিত। কিলারিতে এসে, দিদির বাড়ি না গিয়ে, সোজা লাতুরে যাওয়ার মানে হয় না। বাড়িটা হয়ত নেই। মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে। তবু ধ্বংসস্তূপটা একবার দেখা দরকার। সেখানে এমন কিছু চোখে পড়তে পারে, যা দেখে পরিবারের লোকজনদের হদিস করা যায়। বাড়ির একটা বা দুটো ঘর খাড়া থাকা অসম্ভব নয়। কংক্রিটের ঘর হলে আস্ত থাকার কথা। চৌকো পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি টিনের চালের বেশিরভাগ বাড়ি ভেঙে পড়েছে। কংক্রিটের দু-একটা বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরলেও আর কোনও ক্ষতি হয়নি। ইট্ সিমেন্টের সব বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মুরলির দিদি সম্পর্কে অরিন্দম কিছু জানে না। তাদের বাড়ি পাথর, না সিমেন্টের, প্রশ্ন করার সময় তার নেই। প্রশ্ন করতে ইচ্ছেও করেনি। ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যুঘটনা দেখতে এসেছে সে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মৃত্যুসমাকীর্ণ রণভূমি ঘুরে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন লিখবে। রণক্ষেত্রে কোথাও মানুষ নেই। শুধু মৃতদেহ পড়ে আছে, চিতার আগুন জ্বলছে। আধপোড়া মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি করছে শেয়াল, কুকুর, শকুনি। এখানে মুরলি, তার ছেলে কেশবকে নিয়ে ভাবার সুযোগ নেই। দিদির বাড়ি যাওয়ার জেদ ধরে রাস্তায় মুরলি দাঁড়িয়ে আছে। ভেঙ্কট লাতুরে চলে গেলেও কিলারি ছেড়ে সে নড়বে না, অরিন্দম বুঝতে পারছে। মুরলির আচরণে অস্বাভাবিকতা নেই। কুড়ি দিন আগে যে ঠিকানায় কেশবকে পাঠিয়েছিল, তার কাছাকাছি এসে, ছেলের খোঁজ না করে কেন লাতুরে যাবে? লাতুর ত্রাণশিবির, সেখানকার হাসপাতালে কেশব থাকলেও কিলারির বাড়িতে সবার

আগে খোঁজ করা দরকার।

গাড়ির দরজা খুলেও ভেঙ্কট গাড়ি থেকে নামেনি। মাটিতে এক পা রেখে সিটে বসে আছে। চালকের আসনে ইঞ্জিনের চাবি ধরে বসেছে মজিদ। অরিন্দম বললে চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করবে। মুরলির কাতর মুখে এসে পড়েছে বিকেলের রোদ। চোখদুটো জলে টসটস করছে। অরিন্দমের দিকে সে তাকিয়ে আছে। ভেঙ্কটকে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, আপনার দিদির বাড়ি এখান থেকে কত দূর? প্রশ্ন শুনে ভেঙ্কট তাকাল মুরলির দিকে। মুরলি বলল, ছ-সাত কিলোমিটারের বেশি নয়।

ভেঙ্কট সায় দিল। অরিন্দম একটু অবাক হল। দিদির বাড়ির দূরত্ব, মুরলির চেয়ে ভেঙ্কটের ভাল জানার কথা। মেয়েদের চেয়ে দূরত্বের হিসেব পুরুষ অনেক বেশি রাখে। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে লোকলৌকিকতা করতে গ্রামদেশে পুরুষরা যায়। মেয়েরা বাড়িতে থাকে। মনে সন্দেহ জাগলেও অপেক্ষা করার সময় অরিন্দমের ছিলনা। নিঃশব্দে সময়ের হিসেব কসছিল সে। মুরলির দিদির বাড়িতে এক চক্কর ঘুরে লাতুরে পৌঁছতে এক ঘণ্টা বেশি লাগবে। সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে লাতুরে পৌঁছলে, কলকাতায় খবর পাঠাতে কিছুটা দেরি হবে। সকালের সংবাদপত্রে খবরটা ধরাতে অসুবিধে হবে না। কৌশিকীকে রাত দশটার পরেও ফোন করা যায়। মাথার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বাজছে সুরেলা অথচ ভাঙা গলার দেশজ সুর। রক্ত আনচান করছে। মুরলিকে অরিন্দম বলল, উঠুন, কিল্লারি ঘুরে লাতুর যাব।

বিকেলের রোদ মরে আসছে। মজিদ কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

তিন

'রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুকুর।

(আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বড় রাস্তা থেকে লাল মাটির পথ ধরে দু' কিলোমিটার এগোতে, কিলারি তালুকের সীমানা শুরু হল। তালুকে সাতাশটা গ্রাম আছে। সাতাশটা গ্রামে, বাড়ি আছে প্রায় সাত হাজার। কমবেশি পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ থাকত এখানে। আরও এক কিলোমিটার এগিয়ে গাড়ি থামল। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা এখানে শেষ। মুরলির দিদি লছমির বাড়ি যেতে দু-তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে। আগে সাইকেল রিকশ যেত। ভূমিকম্পে মাটির নিচে ডুবে যাওয়া গ্রামে একজন মানুষ নেই। কীসের আশায় রিকশ নিয়ে চালক সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ? গ্রামে ঢুকে আরও গম্ভীর হয়ে গেছে ভেঙ্কট। মুরলি বলল, কম সময়ে,তার জামাইবাবু দেবদত্ত পিল্লাইয়ের কোর্টির বাড়িতে পৌঁছনোর রাস্তা আছে। জঙ্গল, খাদ আর টিলা পেরিয়ে যেতে হলেও সেই পথে এক কিলোমিটার পথ কম হাঁটতে হয়। আধঘণ্টা সময় বাঁচে। অরিন্দমকে আশ্বস্ত করতে কথাগুলো মুরলি শোনাচ্ছে। অরিন্দম বুঝতে পারছে, দেবদত্তর বাড়িতে তাকে নিয়ে যেতে চায় মুরলি। ভেঙ্কট চুপ। অরিন্দমকে মজিদ ফিসফিস করে বলল, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

মজিদকে নিয়ে একটু সরে দাঁড়াল অরিন্দম। মজিদ বলল, গ্রামের বেশি ভেতরে যাবেন না।

কেন ?

ভূমিকম্পের পর থেকে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে না। অন্ধকারে ফিরতে আপনার অসুবিধে হবে। মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে। রোজ সন্ধের পর বৃষ্টি হচ্ছে।

আলো থাকতে ফিরে আসব।

পারবেন না।

অরিন্দম দমে গেল। গলা আরও নামিয়ে মজিদ বলল, তাছাড়া লুটেরারা গ্রামে ঢুকে পড়েছে। পুলিশের ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকে। রাত নামলে কাজে নেমে পড়ে। ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করে। রাত শেষ হওয়ার আগে ঘুরপথে পাচার হয়ে যায় লুটের মাল। ঠেকাবার কেউ নেই। রাতে চৌকি ছেড়ে পুলিশ কদাচিৎ টহলে বেরয়। দু-একজন ধরা পড়ে। তার জন্যে লুট বন্ধ হয়নি। দরকার হলে তারা জানে খতম করে দিতে পারে। লাশের গাদায় আর একটা লাশ ঢুকিয়ে দিলে কে খোঁজ করবে!

কথাটা শুনে ভয় পেল অরিন্দম। পাডসালগি আভাসে কথাটা বলেছিল। সন্ধের পরে গ্রামে থাকতে বারণ করেছিল। বারণ করার কারণ অরিন্দম এখন বুঝতে পারছে। চাপা গলার মুরলির সঙ্গে ভেঙ্কট কথা বলছে। কথা বলার ভঙ্গিতে অরিন্দমের মনে হল, মুরলিকে আটকাতে চাইছে ভেঙ্কট। মজিদ বলল, গাড়ি ছেড়ে আমি যেতে পারব না। আপনারা চলে গেলে বড় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়াব। লাতুর পেঁছিতে রাত দশটা বেজে যাবে।

নিস্তব্ধ গ্রাম। ইটের রাস্তা ডানদিকে সোজা চলে গেছে। রাস্তার দু'পাশে সারি দিয়ে ছোট ছোট ঘর। দেখে বোঝা যায়, দোকানঘর। বাজার এলাকা। দোকানঘরের ঝাঁপ বন্ধ। সজোরে কিল মেরে টিনের চাল, টালির ছাউনি, অ্যাসবেস্টস ঘরের মাথা কেউ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কিছু ঘরের দেওয়াল ধসে গেছে। মনিহারি দোকানের সামনে প্লাস্টিকের কয়েকটা ভাঙাচোরা ঝুমঝুমি পড়ে আছে। কিলারিতে ঢুকে মুরলির মুখের চেহারা বদলে গেছে। উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে মুখ। কেশবের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে বাতাসে। আকাশের দিকে তাকাল অরিন্দম। পুব আকাশের কালচে লাল মেঘ পশ্চিমে ছড়াচ্ছে। অরিন্দমের সামনে এসে মুরলি বলল, চলুন।

অরিন্দম থতমত খেয়ে গেল। বলল, আপনারা যান। আমি থাকছি। কাছাকাছি বাড়িঘরগুলো দেখে নিই।

এক মুহূর্ত থেমে অরিন্দম আবার বলল, আপনার দিদির বাড়ি যদি এখান থেকে জঙ্গলের পথে দু'কিলোমিটারের বেশি না হয়, তাহলে যাতায়াতে এক-দেড় ঘণ্টা লাগবে। এখনও পাঁচটা বাজেনি। সাতটা পর্যন্ত আমি থাকব। গাড়ি এখানে না দেখলে বড় রাস্তায়

চলে যাবেন।

মুরলি বলল, চক পর্যন্ত চলুন। তালুকের শুরু সেখান থেকে। তারপর আমরা বাঁদিকে পাহাড়ি পথে চলে যাব। আপনি গাড়িতে ফিরবেন।

মুরলির কথাটা অরিন্দমের পছন্দ হল। চক পর্যন্ত যেতে সে রাজি হল। গাড়ি থেকে ক্যামেরা নিল। ভাঙা দোকানের সামনে পড়ে থাকা ঝুমঝুমির ছবি তুলল। মজিদ আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, সঙ্গে বেশি টাকাকড়ি নেই তো?

প্রশ্নটা নতুন করে ঘাবড়ে দিল অরিন্দমকে। তবু হাসল। ঝুঁকি আছে জেনেও সে যাচ্ছে। ভূমিকম্পে মৃত ত্রিশ হাজার মানুষের খবরাখবর করতে এলে কিছু ঝুঁকি নিতে হয়। সে অনুভব করছে, তার খবরের কাঠামো বদলাতে শুরু করেছে। কেশব নামে আট বছরের একটা ছেলে বদলে দিচ্ছে তার প্রতিবেদনের কারিগরি, দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়িতে এই মুহূর্তে কেশব থাকতে পারে, না-ও পারে। না থাকার সম্ভাবনা বেশি। কেশব যেখানেই থাকুক, তার হাত ধরে ত্রিশ হাজার মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অরিন্দম দেখল, গাড়ি লক করে মজিদও পেছনে আসছে। রাস্তার দু'পাশে লাইনবন্দি বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। একটা বাড়ির দাওয়ায় পড়ে আছে মোটর সাইকেলের সিট। খয়েরি রেক্সিনের ওপর ধুলো জমেছে। ডানদিকের বাড়ির জানালায় ঝুলছে পুরনো সবুজ শাড়ির টুকরো দিয়ে তৈরি আধখোলা পর্দা। ভেঙে-পড়া দেওয়ালে কোনওরকমে আটকে আছে গণেশের ছবি। সদরের দেওয়াল মাটিতে মিশে যেতে অন্দরমহলের উঠোন পর্যন্ত অরিন্দম দেখতে পেল। রাস্তা ছেড়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। শুকনো খটখটে কুয়ো। কুয়োর পাশে লাল-নীল কাচের চুড়ির টুকরো ছড়িয়ে আছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে মুরলি। ভেঙ্কট, মজিদ এগিয়ে গেছে। শ্মশানের মধ্যে ঢুকে পড়ে গা ছমছম করছে অরিন্দমের। রাইফেল হাতে উর্দিপরা দু'জন মানুষ সামনে দাঁড়াতে অরিন্দম চমকে গেল। না, লুটেরা নয়। খাকি উর্দিতে মহারাষ্ট্র পুলিসের ফলক লাগানো রয়েছে। গাঁট্টাগোট্টা সর্দার উর্দিধারী পরিচয় জানতে চাইলে পকেট থেকে পরিচয়পত্র বার করে অরিন্দম তাকে দেখাল। পরিচয়পত্র দেখে সঙ্গীকে সে বলল, পত্রকার।

অরিন্দমের পরিচয় পেলেও মুরলিকে নিয়ে তাদের সংশয় কাটছিল না। মুরলির পরিচয় অরিন্দম দিল। ভাষা নিয়ে অসুবিধে হলেও দুই পুলিসকে মুরলির বিপদের কথাটা অরিন্দম বোঝাতে পারল। মজিদ সাহায্য করল অরিন্দমকে। মুরলির কাছে দেবদত্ত পিল্লাইয়ের গ্রামের নাম জানতে চাইল এক পুলিস। মুরলি বলল, কোউটি।

সে তো অনেক দূর!

মুরলি বলল, জঙ্গলের রাস্তায় যাব। খুব বেশি দু'কিলোমিটার।

মুরলির জবাব দুই পুলিসের পছন্দ হল না। তারা খুব চাওয়া-চায়ি করল। মুরলি ভেঙ্কটের সঙ্গে অরিন্দম যাচ্ছে অনুমান করে, তাকে কোউটি যেতে একটু অন্যভাবে বারণ করল। শেষ বিকেলে না গিয়ে কাল সকালে যেতে বলে ছাউনিতে তারা ফিরে গেল। ডানদিকের মাঠে তখনই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ছোট-খাট আগুন নয়। কয়েক কাঠা জমি জুড়ে দাবানলের মত আগুন ছড়িয়ে পড়ল। মজিদ বলল, লাশ পোড়ানো হচ্ছে।

একপলক তাকিয়ে অরিন্দম টের পেল গণচিতায় আগুন দেওয়া হয়েছে। মুরলি দৌড় লাগাল আগুনের দিকে। তার সঙ্গে গেল ভেঙ্কট। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরায় হাত রেখে ফাঁকা মাঠের দিকে পা বাড়াল অরিন্দম। পাশে মজিদ। সূর্য ডুবে গেছে। লালচে অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারপাশ। মজিদের সঙ্গে শ্মশানে পৌঁছে অরিন্দম দেখল, আধপোড়া মানুষগুলোর মুখ ঘুরে ঘুরে মুরলি দেখছে। তার পাশে ভেঙ্কট। আবছা অন্ধকারে কয়েকডজন কুকুর ঝলসানো মৃতদেহ কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। ঝাঁকড়া গাছের মাথায় লাইন দিয়ে বসে আছে শকুন। মজিদ বলল, দশ কাঠা জমি জুড়ে তৈরি শ্মশানে চব্বিশ ঘণ্টায় তিন-চারবার চিতা জ্বলছে। কাঠের চিতায় পেট্রল ঢেলে পোড়ালেও সব লাশ পুড়ছে না। বুলডোজার দিয়ে আধপোড়া লাশ মাটিতে পুঁতে দেওয়া হচ্ছে।

দূরে দাঁড়ানো বুলডোজার আঙুল তুলে মজিদ দেখাল। বুল-ডোজারের পাশে পাঁচ-ছ'জন লোক। মজিদ বলল, এরা পোড়ানোর কাজ করছে। গত পনেরদিনে দু-তিন হাজার লাশ পুড়িয়েছে। সাদা খুলি, হাড় রাস্তায় এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। শিয়াল, কুকুরে সেগুলো টেনে এনেছে। পচা মাংসের গন্ধে অরিন্দমের

গা গুলিয়ে উঠল। তার কানের পাশে এসে কেউ ফিসফিস করে বলল, চুপ, কথা বল না। আমার বৌ, ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনিরা এখানে ঘুমোচ্ছে।

কানের পাতায় গরম শ্বাস পড়তে লাফ দিয়ে সরে গেল অরিন্দম। বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে। উলিডুলি পোশাক, ঘোলাটে চোখ, জট পাকানো চুল বুড়ো লোকটাকে দেখিয়ে মজিদ বলল, পাগল। ভূমিকম্পে লোকটার পরিবারের সবাই মারা গেছে। সারাদিন এখানে পড়ে থাকে। প্রথমবার এসেও দেখেছি।

রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে অরিন্দম। মাঠের দু'পাশে বুনো ঝোপ। মজিদ বলল, ঝোপের গা ঘেঁষে হাঁটবেন না, শেয়াল আছে। এক, দুটো নয়, অনেক। জ্যান্ত মানুষের ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রাস্তায় এসে লম্বা শ্বাস ফেলল অরিন্দম। জ্বলন্ত চিতার দুটো ছবি তুলে মনে হল, রাত একটু বাড়লে ছবি আরও ভাল হত। গাড়িতে ফেরার পথে আরও কিছু ছবি তুলবে। শ্মশান থেকে মুরলি, ভেঙ্কট ফিরে এল। আরও একটু এগোলে চক। তারপর জঙ্গলের পথ ধরে কোউটি গ্রামে দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়ি যাবে মুরলি, ভেঙ্কট। অরিন্দম গাড়িতে ফিরবে। অরিন্দমকে মজিদ বলল, চলুন, গাড়িতে গিয়ে বসবেন।

চক পর্যন্ত গিয়ে ফিরব।

মজিদ এক মুহূর্ত ভেবে বলল, আমি গাড়িতে আছি। টায়ার বা ব্যাটারি চুরি হয়ে গেলে এখান থেকে আজ বেরতে পারব না।

তাকে আটকাল না অরিন্দম। মজিদ চলে গেল। ঘোলাটে অন্ধকারে কবরের মত নিঃশব্দ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের মনে হল, মহেঞ্জোদারোর অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে। সারাজীবন এখান থেকে বেরতে পারবে না। চকের কাছাকাছি পৌঁছে অরিন্দমকে নিচু গলায় ভেঙ্কট বলল, কোউটিতে যাবেন না।

কথাটা প্রথমে অরিন্দম শুনতে পায়নি। তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভেঙ্কট আবার বলল, কোউটিতে যাবেন না।

কেন ?

লাভ নেই।

অরিন্দমের পায়ের নিচে মাটি কেঁপে গেল। মনে হল, ত্রিশে

সেণ্টেশ্বরের মত আবার ভূমিকম্প হচ্ছে। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, মুরলিকে জানিয়েছেন ?

না।

কেন ?

বিশ্বাস করবে না।

ভেঙ্কটের জবাব ধাঁধার মত শোনাল। অরিন্দম কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মুরলি দাঁড়িয়ে গেল। দুজনকে ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল সে। পেছনে তাকিয়ে বলল, পা চালিয়ে চলুন। তা না হলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে

কথা শেষ করে মুরলি দাঁড়িয়ে থাকল। দু'চোখ ছোট করে ভেঙ্কটকে সে নজর করছে। তার তাকানোর ভঙ্গিটা অরিন্দমের ভালো লাগল না। মুরলির পাশে এসে অরিন্দম বলল, চক পর্যন্ত গিয়ে আমি গাড়িতে ফিরব। সাতটা পর্যন্ত আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে লাতুর রওনা হব।

মুরলি সাড়া করল না। ভেঙ্কটের গা ঘেঁষে সে হেঁটে চলেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চকের সামনে তিনজন পেঁছে গেল। শানবাঁধানো চণ্ডীমণ্ডপের মত গোল চাতাল ঘিরে অনেকটা ফাঁকা জমি। দু'পাশে পাথরের বড়সড় বাড়িগুলো তাসের ইমারতের মত ধসে গেলেও কিলারির সবচেয়ে সম্পন্ন পাড়াটা একনজরে অরিন্দম চিনতে পারল। বাঁদিকে লাল মাটির পথ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে পথটা জঙ্গলে মিশেছে। ঝকঝকে লাল সিমেণ্টের চাতালের পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার দু'পাশের বাড়ি, দোকানপাট, বিশাল গাছগুলো অরিন্দম দেখতে থাকল। জনমানবহীন সাজানো লোকালয়। কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। চাতালের ওপর বসে সিগারেট ধরাল অরিন্দম। মুরলি, ভেঙ্কটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, আপনারা এগোন। সাতটার মধ্যে ফিরে আসবেন।

মুরলি তাকিয়ে আছে ভেঙ্কটের দিকে। ভেঙ্কটের নড়ার লক্ষণ নেই। মুরলি বলল, আমি একা যাচ্ছি। জানতাম তুমি যাবে না।

ভেঙ্কট তেলুগু ভাষায় কিছু বলতে মুরলির দু'চোখের মণি জ্বলে উঠল। দুহাতের পাতায় কান ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি মিথ্যুক। তুমি পাজি। কেশব

বেঁচে আছে। দেবদত্তজির ঘরে আমার পথ চেয়ে সে অপেক্ষা করছে।

থুঃ। ঘেন্নায় থুতু ছেটাল মুরলি। পিঠে হাত রেখে তাকে শান্ত করতে চাইল ভেংকট। এক ঝটকায় সে সরে গেল। ভাইবোনের ঝগড়া দেখে বিব্রত হল অরিন্দম। টুকরো টুকরো কথা চালাচালি করছে দুজন। অরিন্দম একবর্ণ বুঝতে পারছে না। মুরলির কথা কিছুটা ধরতে পারলেও ভেংকটের ভাষা পুরোপুরি দুর্বোধ্য। মুরলি মারাঠিতে, ভেংকট তেলুগুতে কথা বলছে। কোনও একটা ভাষা জানা থাকলে মিটমাট করানোর চেষ্টা করতে সে। ঝগড়াটে গেঁয়ো মেয়ের মতো কুঁকড়ে গেছে মুরলির মুখ। রাগে সে কাঁপছে। অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে ভাঙাহিন্দিতে বলল, এই লোকটা আমার ভাই নয়। আমার বিপদের দিনে ভুল বুঝিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে এনেছে। এখন বলছে দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়ির কেউ বেঁচে নেই। ওর কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে মুরলি বলল, তুমি না গেলেও আমি কোউটি যাচ্ছি।

মুরলির কথায় রাগের চেয়ে অভিমান বেশি। মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ভেংকটকে দেখতে চায় না।

ভেংকট বলল, তোমাকে একা ছাড়ব না। আমিও যাব। দেবদত্তানির বাড়িতে কাউকে না পেলেও যাব।

বাঁদিকের রাস্তা ধরে মুরলি হাঁটতে শুরু করেছে। তাকে ধরতে হনহন করে এগোচ্ছে ভেংকট। ভেংকট যে মুরলির ভাই নয়, এমন এক আবছা সন্দেহ আগেই করেছিল অরিন্দম। মুরলি স্পষ্ট করে কথাটা বলতে ধাঁধার সমাধান হল। ভাই না হলে সম্পর্কটা কী? এক গাঁয়ের লোক, পড়শী। শুধু পড়শী নয়, তার চেয়ে বেশি। ভেংকটের হাবভাবে অরিন্দম আন্দাজ করেছিল। দুপুরে গাড়িতে তোলার পর থেকে ভেংকটের সঙ্গে মুরলির সলজ্জ দূরত্ব অরিন্দম নজর করেছে, পারিবারিক বিপদ নিয়ে দু'ভাইবোন যেভাবে কথা বলে, ভেংকট বলছিল না। মুরলির সব কথাতে সায় দিয়ে যাচ্ছিল। কিলারি ত্রাণশিবির থেকে দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়ির দূরত্ব বলতে মুরলির দিকে তাকিয়েছিল। কেন তাকিয়েছিল,

বুঝতে অরিন্দমের দেরি হয়নি। কোউটি গ্রামে ভেঙ্কট কখনও যায়নি। বড় রাস্তা থেকে কোউটির দূরত্ব সে জানে না। মুরলির সঙ্গে অন্য কারণে এসেছে ভেঙ্কট। কারণটা অরিন্দম অনুমান করতে পারছে। ত্রিশ হাজার মৃত্যুর মধ্যে কারণটা বেঁচে আছে। ভেঙ্কটই বাঁচিয়ে রেখেছে। বাঁচিয়ে রাখতে মুরলিও নারাজ নয়। ছেলের খোঁজে ভেঙ্কটের সঙ্গে ওমরগা থেকে কিলারিতে চলে এসেছে। ভেঙ্কটকে বিশ্বাস না করলে আসত না। ভেঙ্কটের ওপর আস্থা না থাকলে, এই দুর্যোগে বাড়ির বাইরে বেরতে সাহস পেত না। আপদে বিপদে ভেঙ্কটের ওপর নির্ভর করে, ভেঙ্কটের সাহায্য নেয়। বিশ্বাস থেকে মুরলির মনে অন্যরকম অনুভূতি গড়ে উঠতে পারে। মুরলির বয়স আটাশ। সে বধূ, মা এবং যুবতী। আবেগ এখনও তাকে ছেড়ে যায়নি। স্বপ্ন দেখা, তার পক্ষে অসম্ভব নয়। ভেঙ্কট সম্পর্কে মুরলির মনে সেই অনুভূতি হয়ত তার বিয়ের আগে তৈরি হয়েছে। গভীর সেই অনুভূতি থেকে গড়ে উঠেছে অন্ধ বিশ্বাস। বিবাহিত, ছেলেমেয়ের মা, মুরলি গোপনে সেই অনুভূতি মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভেঙ্কটের সঙ্গে অনায়াসে কিলারিতে চলে আসতে পেরেছে। মুরলির ডাকে ভেঙ্কটও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। চার ঘণ্টায় ভেঙ্কটের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও খবর অরিন্দম জানতে পারেনি। মুরলি আর তার পরিবারের নানা কথা ভেঙ্কট বললেও নিজের বিষয়ে মুখ খোলেনি। সে বিবাহিত কিনা, অরিন্দম এখনও জানে না। জানার দরকার বোধ করেনি। রাস্তা থেকে দুজন মানুষকে গাড়িতে তুলে রাস্তায় কোথাও নামিয়ে দিলে তার দায়িত্ব শেষ। তাদের সঙ্গে আলাপ জমানোর দরকার কি? সময় কোথায়? সময় কাটাতে কথা বলে যাওয়া গ্রাম্যতা। সমুদ্র থেকে এক আঁজলা জল তুলে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার মত পথের আলাপ মানুষ পথেই শেষ করে দেয়। ঘটনা মোড় ঘুরতে ভেঙ্কট সম্পর্কে অরিন্দমের কৌতূহল বেড়ে গেল। দেবদত্ত পিল্লাইয়ের পরিবারে কেউ বেঁচে নেই জেনেও তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য ঘরসংসার ছেলে যে রওনা দিতে পারে, সে হেলাফেলার লোক নয়। সে জানে, মুরলির ছেলে কেশবও বেঁচে নেই। অথচ ছেলের কাছে মুরলিকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। কিলারি পর্যন্ত এসে কোউটিতে দেবদত্তর বাড়িতে যেতে

দ্বিধা করছে। তাহলে এতদূর এল কেন? দুদিনে মুরলির পাশে থাকতে চায়। আগলে রাখতে চায় তাকে। আর কিছু কি চায় না? ভেঙ্কটের সঙ্গে কথা বললে জানা যায়। ভূমিকম্পের খবর করতে এসে উপন্যাসের জালে জড়িয়ে গিয়ে অরিন্দম অস্বস্তি বোধ করল। সে কেন দুজন অচেনা মানুষের সঙ্গী হয়েছে? প্রশ্নটা মনে জাগতে অরিন্দম থতমত খেল। টের পেল, ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু নিয়ে খবর করতে এসে অন্য খেলায় জড়িয়ে পড়েছে। ভাঙা নারী কণ্ঠের মেঠো গান, আষ্টেপৃষ্টে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। গানের সুরে আফিম ছিল। জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে মুরলি। পাশে ভেঙ্কট। মুরলিকে ভেঙ্কট কিছু বোঝাতে চাইছে। মুরলি কথা বলছে না। তার চলার গতি কমেছে। স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে। চাতাল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অরিন্দম। হায়দরাবাদ থেকে টেলিফোনে লাতুরে ডেকান হোটেলে তার ঘর 'বুক' করে রেখেছে নাগেশ্বর রেড্ডি। ভূমিকম্পের ঠিক পরে ডেকান হোটেলে নাগেশ্বর তিনদিন কাটিয়ে এসেছে। হোটেলের উল্টোদিকে টেলিপ্রিন্টার অফিস। যত রাত হোক, কলকাতায় খবর পাঠাতে অসুবিধে হবে না। হোটেল থেকে কৌশিকীকে ফোন করা যাবে। মুরলি, ভেঙ্কটের সঙ্গে কোউটি যেতে অসুবিধে কি? সাতটা পর্যন্ত গাড়িতে বসে না থেকে বিধ্বস্ত লোকালয়ের কিছুটা, এই সময়ে দেখে নেওয়া যায়। মুরলির সঙ্গে ভেঙ্কটের সম্পর্ক নতুন বাঁক নিয়েছে। তাদের ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। সেই রহস্যের টান কম নয়। ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে মিশে তা আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ভাইবোন পরিচয় দিয়ে যারা গাড়িতে উঠেছিল, তারা আসলে ভাইবোন নয়। সম্ভবত তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই। ওমরগা তালুকের কোনও এক গ্রামে পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। প্রতিবেশী দুই গ্রামের বাসিন্দা হতে পারে। সম্পর্ক যাই হোক, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা আছে। শ্বশুর-শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে ভেঙ্কটের সঙ্গে মুরলি কিলারি এসেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে হয়তো আসেনি। মায়ের কাছে দু বছরের মেয়েকে রেখে সেখান থেকে ভেঙ্কটকে সঙ্গে নিয়েছে। সেটাই সম্ভব। ভেঙ্কটের সঙ্গে বাপের বাড়ির সূত্রে পরিচয়। প্রাক্‌বিবাহ যোগাযোগ আজও বজায় আছে। পারিবারিক

সম্পর্কের চেয়ে তার বাঁধন কম নয়। হয়ত বেশি। ভেঙ্কটের সঙ্গে মুরলি তাই নিশ্চিন্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

গাড়িতে ফিরে যাবে ভেবেও অরিন্দম লাল মাটির পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। মুরলি ভেঙ্কটের জীবনে সে ঢুকে পড়েছে। ত্রিশ হাজার মৃত্যুর চেয়ে সে জীবনের টান কম নয়। তাদের ছেড়ে এখন সে চলে যেতে পারবে না। ডানদিকে দুটো বাড়ি মাটিতে মিশে গেছে। বাঁপাশে কয়েকটা খাপরার চাল, মাটির ঝুপড়ি। পোড়া মাটির কিছু খাপরা রাস্তার ধারে ছড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ ভাঙা। ছাউনির সামান্য ক্ষতি হলেও ঝুপড়ি ভাঙেনি। বাইরে থেকে দেখে বাসোপযোগী মনে হলেও ভেতরে মানুষের সাড়া নেই। বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে গেছে। হায়দরাবাদে, 'ক্রনিকল' দপ্তরে বসে নাগেশ্বর বলেছিল, ভূমিকম্পে লাতুর ওসমানাবাদ জেলার গ্রামগুলোতে ঝুপড়িবাসীরা বেঁচে গেছে। খুব কম ঝুপড়ি ভেঙে পড়েছে। ঝুপড়ি চাপা পড়ে মারা যাওয়ার খবর, বিশেষ নেই। খড় বা খাপরার ছাউনি দেওয়া ঝুপড়ির ওজন এমন কিছু নয়। ছাউনি ভেঙে মাথায় পড়লে অল্প চোট লাগতে পারে। কিছু মাটির দেওয়াল ধসে পড়ার আগে ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। ধুলো ঝেড়ে ঝুপড়ির বাসিন্দরা বেরিয়ে এসেছে। পাথরের বাড়ির বাসিন্দারা পাথরের স্তূপ ঠেলে বেরতে পারেনি। পাথরের চাপে মাটিতে পিষে গেছে। দক্ষিণপূর্ব মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলোতে কৃষিজীবী মাঝারি চাষীরা সংখ্যায় বেশি। গ্রামজীবনের চাবিকাঠি তাদের হাতে। ফসল ফলাতে তারা ওস্তাদ। কৃষিঅর্থনীতি তারাই খাড়া রেখেছে। ভূমিকম্পে মৃতদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যচাষী। তারাই গ্রামের মেরুদণ্ড। তারা মারা যেতে গ্রামাঞ্চল নেতৃত্বহীন হয়ে গেছে। মেরুদণ্ড ভেঙে যেতে ঝুপড়িবাসী গরিবচাষী, খেতমজুর গ্রামে থাকতে সাহস পাচ্ছে না। বাড়িঘর বন্ধ করে তারা পালাচ্ছে। পালানোর আরও কারণ আছে। দুটো জেলার মানুষ রোজ সন্ধের পর থেকে আরও এক ভূমিকম্পের আশঙ্কায় কাঁপছে। বাড়ি অক্ষত থাকলেও রাতে মাঠে গিয়ে শোয়। বাড়ি ফেরে সকালে। লাতুর শহর, যেখানে, ভূমিকম্প আঁচড় কাটতে পারেনি, সেখানেও ভয় ছড়িয়ে পড়েছে। রাত এগারটা বাজলে পাকা বাড়ি, পাথরের বাড়ির বাসিন্দারা বগলে বিছানা নিয়ে মাঠে চলে যায়। সেখানে রাত

কাটায়। ডেকান হোটেলেও রাত সাড়ে দশটার পরে ফরমাশ খাটার কর্মী পাওয়া যায় না। হোটেলের সামনে বাগানে, পেছনে মাঠে, তারা ঘুমোতে যায়। সকাল ছ'টার আগে ফেরে না।

এসব খবর দিয়েছিল নাগেশ্বর। নাগেশ্বরের বিবরণে ভুল নেই। পাশাপাশি দুটো ঝুপড়ির দরজায় তালা লাগানো। পলকা দরজা। তার চেয়েও পলকা তালা। তালার চেহারা দেখে কোনও লুটেরা ভাঙতে উৎসাহ পাবে না। সামনে তাকিয়ে অরিন্দম দেখল, মুরলি দাঁড়িয়ে গেছে। অপেক্ষা করছে তার জন্য। অরিন্দম না এসে পারবে না, মুরলি যেন আগে থেকে জানত। অরিন্দমকে দেখে ভেঙ্কট ভরসা পেল, মুরলির ছাপা শাড়িতে সূর্যমুখীর আভা ঈষৎ চকচকে হল। বেলা গড়িয়ে গেছে। লালচে অন্ধকার ধূসর হচ্ছে। সামনে জঙ্গল। ঝাপসা আলোয় ঝাঁকড়া, বিশাল গাছগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। অচেনা গাছ। গাছের গুঁড়ি ঘিরে বুনো ঝোপ। রাস্তা ক্রমশ সরু হয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেছে। পায়ে চলা পথ ফিতের মত এঁকেবেঁকে গাছপালার আড়ালে মিশে আছে। শিমুল তুলোর গাছগুলো অরিন্দম চিনতে পারল। চকচকে রুপোলি গুঁড়ি। পাতা খসে গেছে। গাছের মাথা জুড়ে লাল পদ্মফুলের কুঁড়ির মত ফল ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মুখে এসে দাঁড়াল তিনজন। সামনে পায়ে চলা পথ। পাশাপাশি তিনজনের হাঁটার উপায় নেই। ভেঙ্কট এগিয়ে গেল। তার পেছনে মুরলি, সব শেষে অরিন্দম। চকে পৌঁছে দিদির বাড়ি যাওয়ার জন্য মুরলি যত তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল, তার হাঁটার ভঙ্গিতে এখন সে উদ্দীপনা নেই। ভেঙ্কটের সঙ্গে সমান তালে হাঁটলেও কথা বলছে না। নিস্তব্ধ জঙ্গলে তিন জোড়া পায়ের শব্দ ভুতুড়ে ধ্বনির মত শোনাচ্ছে। ঝোপের মাথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে ধুলো। ভূমিকম্পের ধুলো এখনও থিতোয়নি। পথের ওপর ছোট-বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে আছে। ভেঙ্কট হোঁচট খেতে অরিন্দম সতর্ক হল। মুরলীর গ্রীবা, পিঠ, কোমরের বাঁকগুলো অরিন্দম দেখতে পাচ্ছে। মাথার ঢাউস খোঁপা একটু টসকায়নি। মেয়ে হিসেবে মুরলি ফেলনা নয়, ভাল করে দেখে অরিন্দম বুঝতে পারছে। পেছনে তাকাল মুরলি। বলল, বাবুজি, আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি।

মুরলির কথাতে অসহায়তা ফুটে উঠল। অরিন্দম চুপ। ভেঙ্কটের সামনে দিয়ে সাঁ করে রাস্তা পেরিয়ে গেল একটা শেয়াল। ভেঙ্কট দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে তাকিয়ে মুরলিকে দেখল। পথের চেহারা বদলাচ্ছে। সামনে উঁচুনিচু পাথুরে জমি। বড় বড়পাথরের চাঁই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। পাতলা হচ্ছে গাছগাছালির ভিড়। ফাঁকা পাথুরে মাঠের মধ্যে সরু এক জলস্রোত আচমকা বেরিয়ে পড়ল। সেচের খাল। খালের ওপর কাঠের সাঁকো। মুরলি বলল, তিরনা নদীর জল এই খাল দিয়ে আসে। সারা বছর জলে বোঝাই থাকে খাল। চাষের কাজ হয়। গ্রামের মানুষ ঘর গেরস্থালিতে এই জল ব্যবহার করে।

সাঁকোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অরিন্দম দেখল, খালে চড়া পড়ে গেছে। বৃষ্টিতে বেলেমাটির খাত, ভিজে চটচটে হয়ে আছে। খালে জল নেই। ভূমিকম্পে কি জলস্রোত শুকিয়ে যায়? যেতে পারে। খালের বুকে ফাটল ধরে মাটির তলায় জল নেমে গেছে। সাঁকো থেকে নামতে গিয়ে আধভেজা মাটিতে কয়েক জোড়া পায়ের ছাপ দেখে ভেঙ্কট দাঁড়িয়ে গেল। পাথুরে বনভূমিতে অন্ধকার নামছে। অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। পায়ের ছাপগুলো তবু ভেঙ্কটের নজর এড়ায়নি। উবু হয়ে বসে অরিন্দম দেখল। তাজা ছাপ। পায়ে জুতো আছে। জুতোর গোড়ালির দাগ যত গভীর সামনের অংশ তেমন নয়। ঘণ্টাখানেক আগে তিন-চারজন লোক যে এই পথে হেঁটে গেছে, সন্দেহ নেই। ভেঙ্কটের মুখ শুকিয়ে গেছে। মুরলির দিকে সে তাকাল। মুরলি বলল, আত্মীয়দের খোঁজ করতে আরও কত লোক এখান দিয়ে গেছে, কে বলতে পারে!

মুরলি সহজভাবে কথাটা বললেও ভেঙ্কটের কপালের চামড়া কুঁচকে থাকল। অরিন্দম কথা বলল না। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। জনমানবহীন গ্রামের বাড়িগুলো, যারা খুশিমত লুটপাট করছে, তারা কাছাকাছি আছে। গা ঢাকা দিতে গাছপালা, পাহাড়ি টিলা ঘেরা এমন যোগ্য জায়গা পথের শুরু থেকে অরিন্দমের চোখে পড়েনি। অবশ্য লুটেরাদের গা ঢাকা দেওয়ার দরকার নেই। সদর রাস্তায় পুলিশ টহল দিলেও এখানে কেউ ধরতে আসছে না তাদের। দিন শেষ হলে, পোয়াবারো। কেউ তাদের ঠেকাবে না। প্রত্যেকটা বাড়ির দরজা তাদের সামনে হাট করে খোলা। যে কোন বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারে।

লুকিয়ে থাকতে পারে। কাকপক্ষী জানতে পারবে না। গ্রামে কাকপক্ষী নেই। সন্ধের মুখে ঘরে ফেরা পাখির ডাক অরিন্দম শোনেনি। গ্রামটাকে কোনও জাদুকর যেন পাষাণপুরী বানিয়ে দিয়েছে। রাস্তায় একটা কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত চোখে পড়েনি। ভূমিকম্পের আগে হয়ত গ্রাম ছেড়ে তারা চলে গেছে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার আভাস সবার আগে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ বুঝতে পারে। লুটেরাদের পায়ের আওয়াজও তারা শুনতে পায়। চোখের আড়ালে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের চেয়ে মানুষকে তাদের ভয় বেশি। মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় মানুষ। সাঁকোর মাথায় কয়েকজোড়া পায়ের ছাপ দেখে অরিন্দম রীতিমত ভয় পেয়েছে। ভূমিকম্পে ত্রিশ হাজার মানুষের জীবনহানি ঘটেছে। প্রকৃতি, নিজের মাসুল আদায় করে নিয়ে চলে গেছে। মাসুল চাইতে আবার ফিরে আসতে পারে। ভূমিকম্পবিধ্বস্ত মানুষ এখনও সেই ভয় পাচ্ছে। প্রকৃতিকে মানুষ ভয় পায়। আবার শ্রদ্ধাও করে। প্রকৃতি যা কেড়ে নেয়, তার হাজারগুণ ফিরিয়ে দেয়। মানুষ শুধু বেড়ে নেয়, লুট করে। মানুষ লোভী, মানুষ দুর্বৃত্ত, ভূমিকম্পের চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর। দুটো মহাযুদ্ধে কতো মানুষ মারা পড়েছিল? কম করে পাঁচ কোটি। কে মারল তাদের? মানুষ। হিরোসিমা, নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমাতে দেড়, দু'লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে, দ্য বেঙ্গল ফেমিনে ত্রিশ, চল্লিশ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছিল। অথচ দেশে তখন চাল ডালের অভাব ছিল না। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে, মানুষ মারা গিয়েছিল। পৃথিবীতে যতো মানুষ আজ পর্যন্ত মারা গেছে, তার সত্তরভাগের জন্যে দায়ী মানুষ। প্রকৃতির ইঙ্গিতে কি এই বিনাশ ঘটছে? মানুষকে খুন করার প্ররোচনা কি প্রকৃতি জোগাচ্ছে? হতে পারে। ফাঁকা উপত্যকার মধ্যে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের মনে হলো, মৃত্যুর ধূসর চালচিত্রের কলাকৌশল সে দেখতে পাচ্ছে। একটু আগে তার দেখা পায়ের ছাপগুলো সে মগজে গেঁথে গেল। ছাপগুলো আকাশ থেকে নেমে আসেনি। পায়ের মালিকরা আশপাশে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে আছে। বহু বছর আরো থাকবে।

সাঁকো ছেড়ে কিছুটা এগোতে জঙ্গল বাঁদিকে সরে গেল। ডানপাশে নুড়িপাথরে ঢাকা পথ। পথের দু'পাশে ছড়ানো ছোট-বড় টিলা। প্রথম টিলা পর্যন্ত গিয়ে মুরলি দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে সুড়ঙ্গের মত লম্বা খাদ। পাথরে ঢাকা রাস্তা দু'ভাগ হয়ে খাদের দু'পাশে চলে গেছে। মুরলি কোন পথে যাবে, বুঝতে পারছে না। ভেঙ্কট কিছু বলল তাকে। মুরলি জবাব দিল। জঙ্গল পেরিয়ে, পাহাড়ি পথে পেঁছে তার ধাঁধা লেগে গেছে। লম্বা খাদের ধার দিয়ে আবছা অন্ধকারে মিশে গেছে দুটো পথ। পথের শেষে বিশাল উপত্যকা। উপত্যকা পেরিয়ে লোকালয়। দু'তিনবার মুরলি এ পথে কোউটি গেছে। কখনও সঙ্গে ছিল তার দিদি লছমি, ভগ্নীপতি দেবদত্ত, কখনও স্বামী, সদাশিব দেশপাণ্ডে। রাস্তা চিনে রাখার দরকার হয়নি। দিদির বাড়িতে পথ চিনে কখনও একা যেতে হবে, সে ভাবেনি। উপত্যকা জুড়ে অন্ধকার ঘন হচ্ছে। কোথাও একবিন্দু আলো নেই। গ্রামের আলো দেখে অচেনা মানুষ পথ খুঁজে এগিয়ে চলে। আলো জ্বালার মত যেখানে কেউ নেই, সেখানে পথ দেখাবে কে? মুরলি হতাশ হওয়ার মেয়ে নয়। দূরের একটা টিলার দিকে আঙুল তুলে বলল, ওই গন্ধমাদন টিলা! হ্যাঁ, গন্ধমাদন পার হয়ে দিদির বাড়ি যেতে হয়ে। গন্ধমাদনকে পেছনে ফেলে একটা মাঠ পেরলে কোউটির রাস্তা।

খাদের বাঁ পাশের পথে মুরলি পা বাড়াল। ভেঙ্কটকে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, টর্চ আছে?

না।

টর্চ না আনার জন্য অরিন্দম আপসোস করল। কোউটিতে দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়িতে পেঁছিলেও ফেরার সময়ে ভুগতে হবে। অন্ধকার রাতে, অচেনা রাস্তায় পায়ে হেঁটে তিন-চার কিলোমিটার পেরনো সহজ নয়। রাস্তাটা পিচের নয়। মেঘ ডাকল আকাশে। লালচে আকাশ, শুঁয়োপোকার মত ফ্যাকাসে কালো হয়ে উঠছে। যে কোনও সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। রোজ সন্ধের পর এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আজই বা হবে না কেন? ফাঁকা মাঠের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে লাট খেয়ে যাবে সে। মাথার ওপর বাজ পড়লে তো কথা নেই।

ভূমিকম্পে মৃত ত্রিশ হাজারের কাছে পৌঁছে যাবে। তারপর? পৃথিবীতে আসার জন্যে কৌশিকীর জঠরে যে ছটফট করছে, সে ভূমিষ্ঠ হবে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে খুঁজবে একজন মানুষকে। সে, তার বাবা। মৃত লোককে খুঁজে পাওয়া যায় না, এ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তার খোঁজা থামবে না। অরিন্দমের মনে হল, মজিদের কথা শুনে বিকেলে লাতুর রওনা হওয়া উচিত ছিল। দুজন আনকা স্ত্রী-পুরুষের পাল্লায় পড়ে এভাবে নাজেহাল হতে হত না। হঠকারিতা করে ফেলেছে। এখনও ফিরে যেতে পারে। এখান থেকে চক খুব বেশি দেড় কিলোমিটার। জঙ্গল পেরলে চকে পেঁছিতে অসুবিধে নেই। তারপর আরও আধ কিলোমিটার হাঁটলে পুলিস চৌকি পেয়ে যাবে। গাড়ি নিয়ে মজিদ সেখানে আছে। গাড়ি না থাকলে বড় রাস্তাতে যেতে হবে। আরও দু কিলোমিটার না হেঁটে উপায় নেই। তবে সে রাস্তা নিরাপদ। দরকার হলে চৌকি থেকে একজন সিপাইকে ডেকে নিতে পারে। মুরলির সঙ্গে ভেঙ্কট চাপা গলায় কথা বলছে। অবোধ্য সে ভাষা অরিন্দম বুঝতে পারছে না। দু'জনের বাক্যালাপের ভঙ্গিতে টের পাচেছ, তৃতীয় একজনকে নিয়ে কথা হচ্ছে। বিষয় যাই হোক, উঁচু গলায় বলার মতো নয়। মুরলির গলার স্বর শুনে অরিন্দমের মনে হল, রাস্তা ভুল হয়নি। বিদ্যুৎ চমকাতে এক ঝলক আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত সে দেখতে পেল। মুরলি বলল, ঠিক জায়গাতে এসে গেছি। টিলা পেরলে গাঁয়ের রাস্তা পেয়ে যাব।

মুরলির কথায় খুশি হওয়ার মত কিছু খুঁজে পেল না অরিন্দম। মুরলির সঙ্গে ভেঙ্কটের সম্পর্ক নিয়ে সে ভাবছে। মুরলিকে ভুল বুঝিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে ভেঙ্কট। একটু আগে কথাটা মুরলি বলেছে। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে, কিলারির আশিভাগ মানুষ যে মারা গেছে, ভেঙ্কট জানত। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির অনেকটা সে জানে। মুরলিকে বলেনি। আরও অনেক খবর হয়ত চেপে গেছে। আসল খবর গোপন করে উল্টো কথা বলেছে। তার কথাতে মুরলির মনে হয়েছিল, কোউটি গ্রামে দেবদত্ত পিল্লাইয়ের পরিবার নিরাপদে আছে। কেশবের কোনও ক্ষতি হয়নি। কিলারি থেকে কেশবকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হবে.

না। আষাঢ়ে গল্পটা ভেঙ্কট কেন মুরলিকে শোনাল? দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়ি পেঁছে মুরলিকে কি কৈফিয়ত সে দেবে? পিল্লাই পরিবারে কেউ বেঁচে নেই, এ কথা অবশ্য সে জানিয়ে দিয়েছে। মুরলি বিশ্বাস করেনি। মিথ্যেকে সত্যি ভাবতে শুরু করলে, সত্যকে মিথ্যা ভাবতে অসুবিধে হয় না। ভেঙ্কটের সত্যি কথাটা মুরলি বিশ্বাস করেনি। মুরলিকে আর কোনও সত্যি কথা ভেঙ্কট বলবে না। দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়ি, মুরলি নিজের চোখে দেখার পরে ভেঙ্কট মুখ খুলতে পারে। অরিন্দমের অনুমান, মুরলিকে শোনানোর মত আরও খবর তার ঝোলায় আছে। একটাও সুসংবাদ নয়। দুঃখের খবরগুলো মুরলিকে বাড়িতে না শুনিয়ে কেন তাকে মৃত্যুসমাকীর্ণ এই উপত্যকায় ভেঙ্কট নিয়ে এল? ভেঙ্কটের মতলব অনেক ভেবেও অরিন্দম বুঝতে পারছে না। কাছে কোনো ঝোপঝাড় থেকে শিয়াল ডেকে উঠল। শিয়ালের গলা পেয়ে, কুকুর ডাকল। লোকালয় দূরে নয়। সামনে কোথাও গ্রাম আছে। গ্রাম ছেড়ে কুকুর-বেড়াল চলে গেলেও বেশি দূরে যায়নি। আশপাশে লুকিয়ে আছে। পরিচিত মানুষদের দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। চেনা গলার ডাক শুনলে দৌড়ে গ্রামে ঢুকে পড়বে। ডানদিকে অন্ধকার খাদের মধ্যে হুড়মুড় করে একটা পাথর গড়িয়ে পড়তে অরিন্দম চমকে উঠল। তখনই সে টের পেল, পেছনে ফেউ লেগেছে। কয়েক জোড়া চোখ আড়াল থেকে তাদের ওপর নজর রাখছে। ধাপে ধাপে তৈরি খাদের দেওয়ালের কোনও একটা ধাপ ধরে অনুসরণ-কারীরা হেঁটে চলেছে। তিনজন পরদেশির সঙ্গে সমান তালে হাঁটছে। দুপক্ষে কোথায় দেখা হবে, অনুসরণকারীরা ঠিক করবে। ঠিক করেই রেখেছে। শুধু সময় নিচ্ছে। খাদের দেওয়াল দিয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে অরিন্দম। তার আশঙ্কা মিলে গেছে। সাঁকোর নিচে যাদের পায়ের ছাপ ছিল, তারা কাছেই আছে। ভেঙ্কটকে উদ্বিগ্ন দেখালেও মুরলির লম্বাটে শ্যামলা মুখে বিশেষ দুশ্চিন্তা নেই। ভেঙ্কটের কথা সে বিশ্বাস করেনি। সাঁকোর পাশে পায়ের ছাপ দেখে ভয় পায়নি। নির্ভয়ে হেঁটে চলেছে। কোডাটিতে দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়িতে কেশবকে পেয়ে যাবে, এমন ভঙ্গি তার প্রতি পদক্ষেপে মিশে আছে। রাস্তায় মাঝে

মাঝে গর্ত। শুকনো পাতায় গর্ত ঢেকে আছে। গর্তে পা ঢুকে যেতে সামান্য চোট পেয়ে মুরলি, অরিন্দমকে ভেঙ্কট সাবধানে হাঁটতে বলছে। ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। খাদের দিকে নজর রাখছে অরিন্দম। ভেঙ্কট ঝুঁকে পড়ে পথের ধার থেকে কিছু তুলে নিল। দু আঙুলে ধরে অরিন্দমকে দেখাল এক টুকরো সিগারেট। অরিন্দম দাঁড়িয়ে গেল। ভাল করে জায়গাটা দেখল। একটা নয়, অনেকগুলো সিগারেটের টুকরো ছড়ানো রয়েছে। রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে কয়েক পা গিয়ে মুরলি একটা বোতল তুলে আনল। বোতল নাকের সামনে ধরে কপাল কুঁচকে বলল, দারু!

বোতলটা সে উপুড় করতে কয়েক ফোঁটা তরল মাটিতে পড়ল। বোতলটা রাস্তার ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল মুরলি। দুপুরে অথবা বিকেলে কয়েকজন এখানে বসে মদ খেয়েছে। বোতলের তলানি শুকোয়নি। সিগারেটের মুখে পোড়া ছাই লেগে আছে। পুরনো টুকরো হলে বৃষ্টির জলে ভিজে হলুদ হয়ে যেত। গলা শুকিয়ে গেছে অরিন্দমের। ফ্লাস্কে গরম চা ছিল। ফ্লাস্ক রয়েছে গাড়িতে। দু বোতল জলও ছিল। তাড়াতাড়িতে আনতে পারেনি। গাড়ি থেকে নামার সময়ে কোটটি যাওয়ার পরিকল্পনা তার ছিল না। ভূমিকম্পের প্রতিবেদন লিখতে এসে অচেনা দুজন মানুষের পারিবারিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। তাদের ছেড়ে একা কিলারি ফেরার উপায় নেই।

চার

ম্যায় ঝুমকা চুকলি খায়ে (ইলা অরুণের গান)

দেবদত্ত পিল্লাইএর বাড়ির সামনে পাথরের মূর্তির মত মুরলি বসে আছে। চারপাশের নিস্তব্ধতা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, কেশব নেই। লাতুর হাসপাতালেও তাকে পাওয়া যাবে না। সন্তান শোকে উন্মাদিনীর মত আকাশ ফাটিয়ে সে কাঁদেনি। একটা কথা বলেনি। পনেরো মিনিট আগে উঠোনের ধার থেকে কেশবের লাল একটা হাফপ্যান্ট কুড়িয়ে, হাতে তুলে নিয়ে বোকা বনে গেছে। সেই যে বসেছে, ওঠার লক্ষণ নেই। উঠলেও তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে

কিলারি পর্যন্ত যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। সামনে দেবদত্ত পিল্লাইএর পাঁচিল ঘেরা বড়সড় বাড়ি। পাঁচিলের কিছুটা খাড়া রয়েছে, কিছু ভেঙে পড়েছে। মূল বাড়ির অর্ধেক মাটির তলায় ঢুকে গেছে। তিনটে ঘরের চিহ্ন নেই। মাটির তলা থেকে বিশাল একটা হাত উঠে এসে ঘরগুলোকে পাতালে টেনে নিয়ে গেছে। সিমেন্টের দুটো রোয়াকে চিড় ধরেনি। সামনের রোয়াকে পাখির খাঁচা ঝুলছে। খাঁচায় একটা ময়না থাকত। খাঁচা খালি। পাখি নেই। পাখিটা মরে যেতে পারে। ত্রাণকর্মীদের কেউ খাঁচা খুলে পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে থাকলে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। খাঁচার সামনে কয়েক সেকেন্ড মুরলি দাঁড়িয়েছিল। কোউটি পৌঁছতে অন্ধকার হয়েছিল। গ্রামের রাস্তায় এসে. দেবদত্ত পিল্লাইএর বাড়ি পেতে মুরলির অসুবিধে হয়নি। নিস্তব্ধ, অন্ধকার গ্রামের অবস্থা দেখে তার মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল। অরিন্দমের মনে হয়েছিল, মেয়েটার মুখ থেকে রক্ত মুহূর্তে উবে গেছে। ভেঙ্কট ভুল কিছু বলেনি। কেশবের কী ঘটেছে, আগে থেকে বুঝতে পেরেছিল। অন্ধকার পাথুরে মাঠের পরে ছোট একটা জোয়ারের খেত পার হয়ে কোউটিতে এসেও অরিন্দম স্বস্তি পাচ্ছিল না। পেছনে ফেলে আসা নির্জন জঙ্গল, উপত্যকার মত গ্রামটাও সমান বিপজ্জনক। পরিত্যক্ত গ্রাম লুটেরাদের দখলে। মৃত আর আধমরা মানুষকে যে ত্রাণকর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, তারা গেরস্থালির জিনিসপত্র, অস্থাবর সম্পত্তি নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করেনি। হয়ত সুযোগ ছিল না। খাট, আলমারি, বাসনকোসন আগলানোর চিন্তা তাদের মাথায় আসেনি। বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে তারা ব্যস্ত ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে পাহারা বসানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে কাজ আইনরক্ষাকারী প্রশাসনের। তারা কতোটা করেছে, অরিন্দম জানেনা। জানার সময় পায়নি। কিলারির মুখে পুলিশ চৌকি দেখে অনুমান করেছিল, মানুষ না থাকলেও গ্রামগুলো অরক্ষিত নয়। তবে সব গ্রাম-ই ফাঁকা। লুট করার অসুবিধে নেই। সোলাপুর, আহমেদনগর, নানদেও, আওরঙ্গাবাদ থেকে দল বেঁধে লুটেরারা গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়েছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে তাদের কাছে। তাদের ঠেকাবার কেউ নেই। সারা এলাকা তাদের দখলে। সেনাবাহিনী, পুলিস, নিয়মমাফিক টহলে এসে তাদের খুঁজে পায়

না। গোপন ডেরায় তারা সরে পড়ে। গ্রাম ছেড়ে বেশিদূরে যায় না। জঙ্গল, মাঠের চেয়ে গ্রামের ভেতরে সাধারণ মানুষের বিপদ বেশি।

দেবদত্ত পিল্লাইএর বাড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে অরিন্দম যখন ভগ্নাবশেষ দেখছিল, মুরলি তখন প্রতিটা ঘর, উঠোন, তন্নতন্ন করে কেশবকে খুঁজেছে। জনমানবহীন ধ্বংসস্তূপে আট বছরের ছেলেকে খুঁজে চলেছে। কেশব কোথাও লুকিয়ে আছে। 'মা' বলে ডেকে এখনই তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভেঙ্কট শক্ত করে মুরলির হাত ধরেছিল। মাঝে মাঝে ছিটকে একা চলে যাচ্ছিল মুরলি। উঠোনে, মাটির তলায় সেঁধিয়ে যাওয়া ঘরের মেঝেতে কোথাও গভীর গর্ত, কোথাও মাটি ঢাকা খাদ। অসতর্ক হলে মাটির নিচে ডুবে যাওয়ার ভয় আছে। মুরলির কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। পায়ের দিকে সে তাকাচ্ছিল না। ভূতে পাওয়া মানুষের মত আচরণ করছিল। ধুলোমাখা লাল হাফপ্যাণ্টটা উঠোন থেকে হঠাৎ পেয়ে যেতে সে পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে গেল। ফিকে অন্ধকার নেমেছে তখন। প্যাণ্টটা তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বারকয়েক বিড়বিড় করল, কেশব।

তারপর মাটিতে বসে পড়ল। থুম হয়ে এখনও সে বসে আছে। দেবদত্ত পিল্লাইএর বাড়ির ছবি তুলল অরিন্দম। কোউটির রাস্তা দিয়ে আসার সময়ে দু-তিনটে ছবি তুলেছে। দেবদত্ত পিল্লাইএর বাড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে আরও একটা জিনিস অরিন্দম লক্ষ করেছিল। চাতালের কোণে পাশাপাশি দাঁড় করানো ছিল তিনটে বোতল। কিছু শালপাতা জড়ো করা ছিল সেখানে। বোতল তিনটে চেনা লেগেছিল। খাদের পাশে রাস্তা থেকে এরকম একটা বোতল এনে মুরলি দেখিয়েছিল। দারুর বোতল। দারু-খোররা বাড়ির দখল নিয়েছে, অরিন্দমের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। বাঘের গুহা ছেড়ে তাড়াতাড়ি কিলারি ফিরতে চাইছিল। নিঝুম হয়ে গিয়েছিল মুরলি। তার কোথাও ফেরার তাড়া নেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে রাস্তার ওপর বসে পড়েছিল। সেখানেই নড়নচড়নহীন বসে আছে। চোখে জল নেই। নির্বিকার মুখ। বাড়ির দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে। তাকে ধাতস্থ হতে সময় দিয়েছিল অরিন্দম।

দেবদত্ত পিল্লাইএর বাড়ির সামনে থেকে অন্ধকার গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম। মুরলির পাশে কিছুক্ষণ উবু হয়ে বসে থেকে অরিন্দমের কাছে এল ভেঙ্কট। খাঁ-খাঁ গ্রাম। অন্ধকার ঘন হচ্ছে। ভেঙ্কটকে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, মুরলি কে হয় আপনার?

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ভেঙ্কট বলল, প্রতিবেশী।

ব্যস?

আরও একটা সম্পর্ক আছে। মুরলির ননদের যেখানে বিয়ে হয়েছে, আমার শ্বশুরবাড়ি সেখানে। মুরলির ননদ, আমার স্ত্রীর বৌদি।

সম্পর্কটা বুঝে উঠতে অরিন্দম সময় নিল। জিজ্ঞেস করল, আপনার স্ত্রীর বৌদি হলেন সদাশিব দেশপাণ্ডের বোন, তাই তো?

হ্যাঁ।

কোথায় আপনার শ্বশুরবাড়ি?

তলনি।

জায়গাটার নাম শুনে অরিন্দম ভড়কে গেল। ভূমিকম্পে তলনিও মাটির নিচে চলে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, কিলারির চেয়ে কম নয়। বরং বেশি। কিলারির ত্রাণশিবিরে তলনির বাসিন্দা ধনরাজ কোনেকে একটু আগে দেখে এসেছে। কথা জোগাচ্ছে না অরিন্দমের মুখে। সূচিভেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুকে সে দেখতে পেল। এরকম নৈঃশব্দ্যে, ছেলেবেলার এক দুপুরে, প্রথম মৃত্যু দেখেছিল। মুরলির সঙ্গে ভেঙ্কটের সম্পর্ক নিয়ে অরিন্দম আর প্রশ্ন করল না। প্রসঙ্গ বদলাল। জিজ্ঞেস করল, দেবদত্ত পিল্লাইয়ের পরিবারের সবাই মারা গেছে, কীভাবে জানালেন?

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ভেঙ্কট। বলল, তার আগে মুরলির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে দু-চার কথা আপনাকে জানানো দরকার। প্রশ্নটা আপনি যখন তুলেছেন, তখন সত্যি কথাটা বলা উচিত। মুরলির সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই। পরিচয় ভাঁড়িয়ে মুরলিকে নিয়ে আপনার গাড়িতে আমি কিলারি এসেছি। আপনাকে ঠকিয়েছি। আসল সম্পর্কটা কিলারির চকে দাঁড়িয়ে মুরলি বলে দিয়েছে। তার কোনও অপরাধ নেই। ছেলের চিন্তায় সে পাগল। তবে মুরলি না বললেও আমি বলতাম। মুরলি

আমার সহোদর বোন নয়। ওমরগা তালুকের এক গ্রামে আমরা বড় হয়েছি। আমার বাবা মারাঠি, মা তেলেগু। মুরলির বাবা তেলেগু, মা মারাঠি। আমাদের দুজনের মাতৃভাষা আলাদা হলেও মারাঠি স্কুলে পড়তাম। মুরলি মারাঠিদের মত উচ্চারণে তেলেগু বলে। আমি তেলেগু উচ্চারণে মারাঠি বলি। আমাদের দুটো পরিবারে যোগাযোগ, যাতায়াত আছে। তবে বিয়ে থা হয় না। মুরলি, বয়সে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের ছোট। প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কখন যে দুজন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, জানতে পারিনি। যখন জানলাম, সদাশিবের সঙ্গে মুরলির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের খবরটা দিয়ে হাপুস নয়নে মুরলি কেঁদেছিল। বাড়ি ছেড়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। সাহস পাইনি। আমার তখন রোজগার ছিল না। দু'একর চাষের জমি থেকে সংসারের ভরণ-পোষণ চলত। সংসারে বিধবা মা, ছোট ভাইবোন ছিল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার চালাতাম। মুরলিকে বিয়ে করতে চাইলে তার মা-বাবা রাজি হত না। দু-পরিবারের গাঁইগোত্র ছিল আলাদা। মুরলিকে বিয়ে করে গ্রামে বাস করা অসম্ভব হত। গ্রামের প্যাটেল, সরপঞ্চ অতিষ্ঠ করে তুলত আমাদের জীবন। তবে সেটা বিয়ে না করার কারণ ছিল না। মা, ভাই, বোনকে নিয়ে যে সংসার, তার মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম। সংসার ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে পারতাম না। আমার চোখের সামনে সদাশিব দেশপাণ্ডের ঘরনী হয়ে গেল মুরলি। তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। বিছনায় শুয়ে সমানে কেঁদেছিলাম। সাতদিন ভাল করে খেতে পারলাম না। মুরলির বয়স তখন উনিশ-কুড়ি। আমি ত্রিশের কম। পাড়ার লোক ভেবেছিল, আমার কঠিন ব্যামো হয়েছে। বছর ঘুরতে মুরলির ছেলে হল। সেই ছেলে কেশব। মুরলির বাপের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল। তলনি গ্রামের বিলাস মুত্তমেচারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল মুরলি। বিলাস মুত্তমেচারের ছেলে বিয়ে করেছিল মুরলির ননদকে। ননদের অনুরোধে বিয়ের কথাটা আমার কাছে মুরলি পেড়েছিল। মুরলির অনুরোধ আমি এড়াতে পারিনি। আমার মাথায় অন্য হিসেব ছিল। মুরলির ননদের

শ্বশুরবাড়িতে জামাই হলে সদাশিব দেশপাণ্ডের পরিবারে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে। জামাইবাড়ির জামাই হওয়া কম কথা নয়। ডবল খাতির পাওয়া যায়। খাতিরের জন্য রাজি হয়েছিলাম, এমন নয়। বিয়ের সূত্রে মুরলির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলাম। মুরলিকে দেখতে পাব, তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব, এই চিন্তা বিভোর করে তুলেছিল আমাকে। বিলাস মুত্তমেচারের মেয়ে সরসীকে বিয়ে করেছিলাম। তারপর ছ'বছর চলে গেছে। মুরলির আকর্ষণ আজও কাটাতে পারিনি। সরসী কিছু না বললেও সম্পর্কটা বুঝতে পারে। ছেলেপুলে না হওয়ার জন্য নিজেকে অপরাধী ভাবছিল সে। তার ধারণা হয়েছিল, তার অক্ষমতার জন্য আমি বারমুখো হয়েছি।

ভেঙ্কট থামলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে ফিসফিস করে বললো, সব কি ঠিক বললাম? বোধ হয় না। মুরলির বিয়ের আয়োজন হচ্ছে, এখবর হঠাৎ পাইনি। বিয়ের কয়েক মাস আগে জেনেছিলাম। ছোটখাটো একটা চাকরি করতাম তখন। মুরলিকে বিয়ে করতে বিশেষ অসুবিধে ছিল না। তবু করিনি। ভয় পেয়েছিলাম। এখন বুঝছি, মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম। আসলে আমরা কখনও সত্যের খুব কাছাকাছি যেতে পারি না। সাহস করে মুরলিকে বিয়ে করলে, সেটাও সত্যিকার সাহস হতো না। আধখানা ভয়, অর্ধেক সাহস নিয়ে মুরলির পেছনে আমি লেগে থাকলাম। এখন বুঝছি সবচেয়ে সত্যবাদী মানুষও পুরো সত্য বলতে পারেনা।

নিঃশব্দে কোউটি গ্রাম ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। কিলারি রওনা হওয়ার কথা অরিন্দম বলতে পারছে না। অবশ্যম্ভাবী এক দুর্ঘটনার জন্য সে তৈরি। দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়ির চাতালে তিনটে মদের বোতল যারা খালি করেছে, তারা বেশি দূরে যায়নি। ধ্বংসস্তূপের অন্ধকার সুড়ঙ্গে তারা না থাকলে, আর একদল আছে। ক্যামেরা, ঘড়ি, মানিব্যাগ, সব বেহাত হবে। মজিদের গাড়িতে ব্রিফকেসে দু'হাজার টাকা আছে। হায়দরাবাদে, অতিথিভবনের ঘরে আছে আড়াই হাজার টাকা, কলকাতা ফেরার প্লেনের টিকিট। প্রাণে বেঁচে গেলে কলকাতা ফিরতে অসুবিধে হবে না। তার আগে অফিসের কাজ সারতে হবে। লাতুর থেকে কলকাতায়

খবর পাঠানোর সঙ্গে কলকাতায় ফিরে বড় প্রতিবেদন লেখার মত যতটা সম্ভব তথ্য জোগাড় করা দরকার। কভার স্টোরি লিখলে, ভেঙ্কট-মুরলির কাহিনী সেই গল্পের অংশ হতে পারে। ভেঙ্কট বলল, বিয়ের ছ'বছর পরে সন্তানসম্ভবা হয়েছিল সরসী। তার অপরাধবোধ কেটে যাচ্ছিল। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছিল। স্ত্রী হিসেবে নিজের অধিকার জারি করতে শুরু করেছিল। বারমুখো স্বামীকে ঘরে আটকাতে চাইছিল। মুরলির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ কমে আসছিল। ইতিমধ্যে ব্যবসা শুরু করেছিলাম আমি। বিয়ের পরে সে ব্যবসা ক্রমশ বাড়ছিল। ওমরগা থেকে মুম্বই, হায়দরাবাদে সূর্যমুখী চালানের বড় ঠিকাদার হয়ে উঠেছিলাম। ব্যবসা এখনও চলছে। সংসারে অভাব নেই। মুরলির সঙ্গে যোগাযোগ কমে এলেও তাকে না দেখে থাকতে পারি না। মুরলির অবস্থাও তাই। ছেলেমেয়ে, সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকলেও হপ্তায় একদিন দেখা না হলে অভিমান করে। তার শ্বশুর, শাশুড়ি কিছু বোঝে কিনা, জানি না। বুঝলেও মুখ খোলে না। একটানা সাত-দশদিন আমাকে না দেখলে মুরলির শ্বশুর আমার বাড়িতে খোঁজ নিতে আসে। তাদের উদ্বেগ মনগড়া নয়। তারা আমাকে ভালবাসে। তাদেরও দরকার হয় আমাকে। শহর থেকে ওষুধ, দরকারি নানা জিনিস কিনে আনা থেকে প্রয়োজনে টাকাপয়সা দিয়ে তাদের সাহায্য করি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, স্ত্রীকে একা রেখে বিবাহিত পুরুষের দূরে কোথাও চাকরি করতে যাওয়া উচিত নয়। কর্মস্থলে স্ত্রীকে সঙ্গে রাখা উচিত। তা না হলে বিপদ ঘটে। আগুনের একটা ফুলকির জন্য সজীব বারুদ উসখুস করতে থাকে। ফুলকির অভাব ঘটে না। সদাশিবের ঘরনী, তার দু ছেলে-মেয়ের মা মুরলির অবস্থা আমি বুঝতে পারতাম। তার মন থেকে স্বামীর মুখ ক্রমশ মুছে যাচ্ছিল। তবু স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারত না। আমাকে ভুলে থাকাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। মুরলিকে ছেড়ে থাকার কথা আমি কল্পনা করতে পারতাম না।

সরসীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর মুরলিকে আমি দিয়েছিলাম। মুরলি খুশি, না অখুশি হয়েছিল, বুঝতে পারিনি। তিন-চারদিন

পরে আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, আমারও একটা বাচ্চা চাই। তুমি দেবে।

কথাটা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। মুরলির মত নম্র, লাজুক মেয়ের মুখ থেকে কথাটা শুনব ভাবিনি। মুরলি কথাটা দ্বিতীয়বার বলে জিজ্ঞেস করেছিল, কবে দেবে ?

জবাব না দিয়ে আমার উপায় ছিল না। বলেছিলাম. যখন তুমি চাইবে।

খুশি হয়ে মুরলি বলেছিল, মনে থাকে যেন।

সাতদিন পরে সরসীকে তলানিতে রাখতে গিয়েছিলাম। প্রসবের তখনও দেড়মাস দেরি। শ্বশুরবাড়িতে তিনদিন ছিলাম। তখনই শুনলাম, সরসীর দাদার স্ত্রী, মানে সদাশিবের বোন যোগিতা সন্তানসম্ভবা। সরসীর দেড়, দুমাস পরে তার বাচ্চা হবে। প্রসবের আগে ওমরগাতে মায়ের কাছে যাবে। তাকে নিতে আসবে তার দাদা সদাশিব। যোগিতা পাশের গ্রামের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকে তাকে চিনতাম। খোশগল্পে শ্বশুরবাড়িতে তিনদিন কেটে গেল। তলানি থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। মুরলির সঙ্গে দেখা করলাম। তার শ্বশুর-শাশুড়িকে যোগিতার খবর দিলাম। ব্যবসার চাপ বাড়ছিল। আরও বেশি করে কাজে ডুবে গেলাম। তিন মাস আগে বোঝা গিয়েছিল, এ বছর সূর্যমুখীর রেকর্ড ফলন হবে। চাষীদের হাতে ফসলের বায়না ধরাতে খুব দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছিল আমাকে। এখানকার কৃষিজীবীদের বেশিরভাগ সম্পন্ন চাষী। ত্রিশ, চল্লিশ একর জমির মালিক। সূর্যমুখীর আবাদের সঙ্গে তাদের কেউ কেউ তেলকল চালায়। ঘানিতে সূর্যমুখী মাড়াই ক'রে বড় কোম্পানিতে তেল জোগান দেয়। সেখানে আর এক দফা পরিশুদ্ধ হয়ে নামী কোম্পানির লেবেল সাঁটা বোতলে সেই তেল দোকানে, বাজারে পৌঁছে যায়। আমি টের পাচ্ছিলাম, সন্তান জন্মের সম্ভাবনার সঙ্গে আমার বরাত খুলতে চলেছে। দারুণ ব্যবসা হবে এবছর। তবু রাতে বিছানায় শুয়ে সরসীর চেয়ে বেশি করে মনে হত মুরলিকে। সেই মুরলি বাচ্চা চেয়েছে। রাজি না হয়ে আমি কী করতে পারতাম ? সময়মত সে পাওনা বুঝে নেবে। সদাশিবের ঘরে আসার সঙ্গে মিলিয়ে মুরলি পাওনা আদায়ের সময় ঠিক করবে। স্বামী

আসার দুদিন আগে, অথবা সোলাপুরে সে ফেরার ঠিক পরে, মুরলি ডাক পাঠাবে আমাকে। কথাটা ভেবে যেমন শিহরিত হচ্ছিলাম, তেমনই এই লুকোচুরি খারাপ লাগছিল। ভেঙ্কট আচারকরের সন্তানের পিতৃপরিচয় বদলে যাবে, মেনে নিতে পারছিলাম না। সদাশিব দেশপাণ্ডেকে সেই সন্তান, বাবা ডাকবে ভেবে কষ্ট হচ্ছিল। কথার খেলাপ করা যাবে না। মুরলি স্ত্রী হতে চেয়েছিল আমার। আমি পেছিয়ে গেছি। তাকে বিয়ে করলে অনায়াসে আমার ছেলেমেয়ের মা হতে পারত সে। ছেলেমেয়েকে পিতৃপরিচয় লুকোতে হত না। মুরলির সঙ্গে সম্পর্ককে আমিই কানাগলিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। পিতৃপরিচয় নিয়ে গুমোর করার অধিকার আমার নেই। মনে তবু অশান্তি ছিল। এমন অনেক কিছু চিন্তা করছিলাম, যা সুস্থ মাথায় মানুষ করে না। দুর্ঘটনায় সদাশিবের মৃত্যু হলে পরিস্থিতি কেমন হতে পারে, ভাবতে শুরু করেছিলাম! উদ্ভট নানা ভাবনা, মাথায় কিলবিল করতে থাকল। প্রসবের সময় সরসীর মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। সেরকম ঘটলে, আমি কী করব? সবচেয়ে জঘন্য চিন্তাটা, ভূমিকম্পের সাত-আটদিন আগে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে মাথায় এল। এমন কোনও দুর্ঘটনা কি ঘটতে পারে না, যা মুরলির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তুলতে পারে? ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় আমরা থাকি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে অনেক ভূমিকম্প দেখেছি। সেরকম বড় ধরনের একটা ভূমিকম্প তো ঘটতে পারে। মুরলি আর আমার মাঝখানে যে দেওয়ালগুলো আড়াল তুলে আছে, ভূমিকম্পে ভেঙে পড়তে পারে। পাপচিন্তায় সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। নরকের কীট মনে হচ্ছিল নিজেকে। অনুশোচনায় বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। আত্মহত্যা করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। আত্মীয়, বন্ধু, চারপাশের মানুষের এত অমঙ্গল যে কামনা করতে পারে, তার বাঁচার অধিকার নেই। পোকা মারার বিষ কিনে শোওয়ার ঘরে লুকিয়ে রাখলাম। এমনই এক দুপুরে তলনি থেকে খবর এল, সরসীর মেয়ে হয়েছে। খবরটা পেয়ে বুকের ভেতর হু-হু করে উঠল। মনে হল, মরতে পারব না। আত্মহত্যা মুলতুবি থাকল। দুপুরে তলনি রওনা হলাম। তলনি পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। আমার শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে ইলেকট্রিক নেই।

কেরোসিনের আলোয় মেয়ের ছোট্ট মুখটা দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মন থেকে বেরিয়ে গেল সব পাপচিন্তা। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে প্রার্থনা করলাম, পৃথিবী থেকে সব অমঙ্গল দূর হয়ে যাক। মানুষ যেন সুখে থাকে। আমার মুখের দিকে হাসিমুখে সরসী তাকিয়েছিল। মা হওয়ার গৌরবে চিকচিক করছিল তার দু'চোখ। চারদিন ছিলাম তলনিতে। সরসী আরও কয়েকদিন থেকে যেতে বলেছিল। যোগিতাকে নিয়ে যেতে যে কোনওদিন সদাশিব আসবে। সদাশিব না আসা পর্যন্ত আমাকে আটকে দিতে চেয়েছিল, আমার শ্বশুর বিলাস মুত্তমেচার। আমি আবার সদাশিবের মুখোমুখি হতে চাইছিলাম না। সদাশিব তলনিতে পেঁছনোর আগের দিন দুপুরে আমি ওমরগা রওনা হলাম। তলনি থেকে বাসে উঠে দেখলাম, উল্টোদিকে একটা বাস থেকে সদাশিব নামল। তার নজর এড়াতে আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। সদাশিব দেখল না আমাকে। সাইকেল রিকশায় চেপে বসল। আমি ওমরগা ফেরার চব্বিশ ঘণ্টা পরে সেই ভয়ানক ভূমিকম্প হল। ত্রিশ হাজার মানুষ কয়েক ঘণ্টায় শেষ হয়ে গেল। তলনিতে আরো চব্বিশ ঘণ্টা আমি থেকে গেলে আজ এই কাহিনী আপনাকে শুনতে হতো না। সেই বিকেলে সদাশিব দেশপাণ্ডে তলনিতে না গেলে প্রাণে বেঁচে যেত। মুরলিকে ঘরে রেখে কেশবের খোঁজে সদাশিব কিলারিতে চলে আসতো। মুরলির সঙ্গে এ জীবনে আমার দেখা হতো না। ভালোই হতো! দুর্ঘটনার খবর শুনে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ভূমিকম্পের তিন দিন পরে তলনি গেলাম। সেনাবাহিনী গ্রাম ঘিরে রেখেছিল। ত্রাণের কাজ সবে শুরু হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে যেতে পারলাম না। বাইরের লোককে গ্রাম ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। ত্রাণকর্মীরা বলল, গ্রামের আশিভাগ মানুষ মারা গেছে। তবু তলনি থেকে নড়লাম না। নিজের মতো করে যুক্তি সাজাতে থাকলাম। গ্রামের আশিভাগ মানুষ মরে গেলেও আমার শ্বশুর বিলাস মুত্তমেচারের পরিবার নিরাপদে আছে। মুত্তমেচার পরিবারের সকলে মাটি চাপা পড়ে মারা গেলেও আমার বৌ, মেয়ে মরে নি। তারা বেঁচে আছে। সুস্থ আছে। গ্রামের বাইরে গাছতলায় দু'দিন পড়ে থেকেও সরসী আর কচি মেয়েটার হদিশ করতে পারলাম না। তলনি থেকে গেলাম কিলারি। সেখানেও

এক অবস্থা। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রাণকর্মীর মুখে গ্রামের খবর শুনে ফিরে আসতে হল। আমার নিজেকে মনে হল নরখাদক। ত্রিশ হাজার মানুষকে আমি খেয়েছি। আমার পাপচিন্তার জন্য দুটো জেলা শ্মশান হয়ে গেছে। প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বিছানা থেকে তিনদিন উঠতে পারিনি। সদাশিব ঘরে ফিরেছে কিনা রোজ লোক পাঠিয়ে খবর নিতাম। দু-তিনবার খবর করতাম। যোগিতাকে নিয়ে সদাশিব ফেরেনি। ভূমিকম্পের দশ দিন পরে, পরশু গিয়েছিলাম মুরলির কাছে। তলনি, কিলারি ঘুরে এসেছি তাকে জানাইনি। সদাশিবকে রিকশ চেপে বিলাস মুত্তমেচারের বাড়ি যেতে দেখেছি, একথা বলার সুযোগ তাই নেই।

ভেঙ্কট থামতে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, সদাশিব কি মারা গেছে?

জানি না। প্রশ্নটা আর করবেন না। তাকে রিকশা চেপে তলনিতে যেতে দেখেছি। এটাই সত্যি। তার মৃতদেহ দেখিনি সে মারা গেছে, বললে মিথ্যে বলা হবে। বেঁচে আছে বললে কি সেটা সত্যিকথা হবে? বাবুজি, আমার সত্যিমিথ্যে জট পাকিয়ে গেছে। গলা পর্যন্ত বিষ নিয়ে আমি বেঁচে আছি। কাউকে বলতে পারছি না। দম বন্ধ হয়ে যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারি। মুরলিকে কেশবের খবর জানাতে গিয়ে আধমরা হয়ে গেছি। তলনিতে সদাশিবকে দেখার কথা মুরলিকে বলতে হলে হার্টফেল করব। তবু মুরলির সঙ্গে এসেছি। দু'বছরের মেয়েটা ছাড়া মুরলির কেউ নেই, আমি জানি। আমারও কেউ নেই। সরসী আর কচি মেয়েটাকে কখনও দেখতে পাব না। ভূমিকম্পের সাতদিন আগে, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে যা কামনা করেছিলাম, তাই ঘটেছে। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। আমি বেহদ্দ পাপী। ত্রিশ হাজার মানুষের লাশের ওপর দিয়ে হেঁটে মুরলির কাছে পেঁৗছে গেছি। লাশের ভিড়ে আমার বৌ, মেয়ে রয়েছে। মুরলির ছেলে, স্বামী আছে। ছেলের খবর মুরলিকে বলতে পারলেও সদাশিবের খবর তাকে জানাতে পারব না। আমার বুক ফেটে যাবে। মুরলি বিধবা হোক, আমি চাইনি। কয়েকদিন আগে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে, মনে যে পাপচিন্তা জেগেছিল, তা খাঁটি নয়। তা নোংরা মনের তাড়না। কয়েকদিনের

জন্যে এসে, চলে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে খারাপ কিছু ভাবতে পারি না। সব সময়ে আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিতদের ভাল চেয়েছি। দুর্বল মুহূর্তে মনে ময়লা জমেছিল। মেয়ের মুখ দেখে তা কেটে যায়। ভেবেছিলাম, আমার অনিষ্ট চিন্তায় কারও খারাপ হবে না। সবার জন্যে আমার শুভেচ্ছা, শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে। তা হল না। মুরলিকে নিয়ে আমি মহাশ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শ্মশানের মধ্যে সব কথা বলা যায়। পাপ, পুণ্য, জীবন, মৃত্যু নিয়ে গোপন করার কিছু থাকে না। সদাশিবের খবর, কোনও এক সময়ে মুরলিকে জানিয়ে দেব। তাড়াতাড়ি বলতে হবে। আমি আর বয়ে বেড়াতে পারছি না। মৃত্যু তো আমার ঘরেও ঢুকে পড়েছে। সরসী, আর মেয়েটাকে কখনও দেখতে পাব না। সোলাপুর থেকে স্বামী ফিরে আসার ভয়ে মুরলি যখন কাঁপছে, আমি জেনে গিয়েছিলাম, সদাশিব ফিরবে না। সরসী আর আমার সদ্যোজাত মেয়ে পৃথিবী থেকে চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। তাদের আর দেখতে পাব না। আমার কণ্ঠনালিতে বিষের থলি বোঝাই হয়ে উঠেছিল। এখন একদম ভরে গেছে। কণ্ঠনালি ফুটো করে যে কোনও মুহূর্তে বিষ বেরিয়ে আসতে পারে। ভূমিকম্পের মাঠে বিষের স্বাদ কি অমৃতের মত লাগে?

অরিন্দম চুপ। তার মুখের দিকে ভেঙ্কট তাকিয়ে আছে। জবাব শোনার জন্য ভেঙ্কট ব্যস্ত নয়। অরিন্দমের মুখের ওপর চোখ রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামতে ভেঙ্কট দৌড়ে মুরলির পাশে চলে গেল। নাম ধরে ডাকল মুরলিকে। মুরলি সাড়া দিল না। ভেঙ্কট হাত ধরে সযত্নে দাঁড় করাল মুরলিকে। পুতুলের মত মুরলি উঠে দাঁড়াল। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গাছের তলা ছেড়ে অরিন্দম চলে এসেছে। দেবদত্ত পিল্লাইয়ের ভুতুড়ে বাড়ির চাতালে আশ্রয় নিল তিনজন। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। বাতাসের সাঁইসাঁই শব্দ শুনতে পাচ্ছে অরিন্দম। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকার চাতাল। ছাদের অর্ধেকটা ভেঙে পড়েছে। বৃষ্টির ছাঁট আসছে। মুরলি বসেছে চাতালের ধার ঘেঁষে। জলের কুঁচো গায়ে এসে লাগছে, খেয়াল নেই। জলের তোড় দেখে অরিন্দম ভয় পেয়েছে। বৃষ্টি থামবে তো? দেড়-দু

ঘণ্টার মধ্যে কিলারিতে না পেঁছিলে লাতুর যেতে রাত বারোটা বেজে যাবে। আজ কলকাতায় খবর পাঠানো যাবে না। কলকাতার অফিস ভূমিকম্পের খবরের জন্য অপেক্ষা করে হতাশ হবে। সবচেয়ে বেশি হতাশ হবে কৌশিকী। মাঝরাত পর্যন্ত তার টেলিফোনের জন্যে বসে থেকে কৌশিকী হয়ত অফিসে ফোন করবে। অরিন্দমের পাশে মেঝেতে বসল ভেঙ্কট। বলল, বাবুজি, আপনাকে খুব অসুবিধেতে ফেলে দিলাম।

এক মুহূর্ত থেমে বলল, বৃষ্টি বেশিক্ষণ হবে না। একটু পরে থেমে যাবে। ভূমিকম্পের আগের দিন সন্ধে থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। এখনও রোজ হচ্ছে। তলনিতে যেদিন গিয়েছিলাম, সেই সন্ধেতেও তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ত্রাণদপ্তরে বসে খবর পেলাম, মাটিতে মিশে গেছে বিলাস মুত্তমেচারের ভিটে। আরও খবর ছিল। মুত্তমেচারের বাড়ির একটা ভাঙা ঘরে পাথরের স্তূপের ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে ছিল। হাতটা দেখে উদ্ধারকর্মীরা স্তূপের তলা থেকে যে মেয়েটির দেহ বার করেছিল, সে-ই সরসী। সাতদিনের মেয়েকে পাশে নিয়ে সে ঘুমোচ্ছিল। মা, মেয়ে, কেউ বেঁচে ছিল না। আমি বিশ্বাস করিনি। সত্যি কি করিনি? আমি টের পেয়েছিলাম, আমার কুচিন্তা ফলতে শুরু করেছে। আমি ফতুর হয়ে যাব। বৃষ্টি থামতে ত্রাণদপ্তর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় বসলাম। নড়াচড়া করার শক্তি ছিল না শরীরে। ভিজে মাটির জল শরীরে ঢুকে যাচ্ছিল। রাস্তার দুধারে অনেক মানুষ। বুক চাপড়ে কেউ কাঁদছিল, কেউ পাগলের মত দাপাদাপি করছিল। নিঝুম হয়ে অন্ধকারে বসেছিল অনেক মানুষ। আত্মীয়স্বজনের খবর নিতে এসে মৃত্যুর কাছাকাছি তারা পেঁছে গিয়েছিল। সারারাত আমি গাছতলায় ছিলাম। সকালে অনুভব করলাম, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। হাত-পায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা। দুদিন বাদেও জ্বর ছাড়ল না। সেই অবস্থাতে কিলারি এসেছিলাম। ত্রাণদপ্তরের একটা গাড়ি কিলারি পেঁছে দিয়েছিল। ত্রাণদপ্তরে গিয়ে জানলাম, তলনির সঙ্গে কিলারির খবরে তফাত নেই। দেবদত্ত পিল্লাইয়ের পরিবারের ভূতল সমাধি হয়েছে। পাড়সালগির দপ্তর তখনও চালু হয়নি। দুটো জেলার

দায়িত্ব ছিল ফৌজিদের হাতে। তাদের দেওয়া খবরে ভুল ছিল না। কিলারিতে গিয়ে আমার জ্বর বেড়েছিল। বাড়ি ছাড়ার চার, পাঁচ দিন পরে ওমরগা ফিরেছিলাম। জ্বরে তখন প্রায় বেহুঁশ হয়ে আছি। এখনও পুরো সুস্থ নই। বুঝতে পারছি, আবার জ্বর হবে। জ্বর ছাড়বে না। ভূমিকম্পে যারা চলে গেছে, তাদের কাছে আমাকে পৌঁছে দেবে। তার আগে তলনির খবর মুরলিকে জানাতে হবে। ভূমিকম্পের দুদিন আগে সদাশিব তলনিতে গেছে, মুরলি আজও জানে না। আমি না জানালে জানার কথা নয়। সোলাপুরে খোঁজ করলে হয়ত জানতে পারত। খোঁজ করবে কী, সদাশিবের ঘরে ফেরার কথা ভেবে সে ভয়ে অস্থির। কেশবকে না দেখলে সদাশিব চটে আগুন হবে। বদমেজাজি মানুষ। ছেলেঅন্ত প্রাণ। সবচেয়ে আগে কেশবকে ফিরিয়ে আনা দরকার। ভূমিকম্পের পনের দিন পরেও মুরলি ভাবছে, তার স্বামী সোলাপুরে আছে। অফিস থেকে ছুটি না পাওয়ায় বাড়ি আসতে পারেনি। সদাশিবের না আসার আরও একটা কারণ হল, ভূমিকম্পে ওমরগা তালুকের কোনও ক্ষতি হয়নি, সব সংবাদপত্রে এখবর ছাপা হয়েছে। কাগজ পড়ে সদাশিব নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে, যে কোনও-দিন সে ফিরতে পারে। তা কি সম্ভব? এরকম সাংঘাতিক একটা ঘটনার পরে ছেলে মেয়ে বৌ-এর কাছে না এসে কেউ কি অফিস করতে পারে? মুরলি এসব ভাবছে না। সে ভেবে চলেছে নিজের ছাঁদে। বাড়ি ফিরে সদাশিবের তলনি যাওয়ার কথা। অন্তঃসত্ত্বা ছোট বোন, যোগিতাকে সেখান থেকে ওমরগায় নিয়ে আসবে। নিজের পরিবার নিরাপদে থাকলেও যোগিতার জন্যে দুশ্চিন্তা না হবার কারণ নেই। তলনি গ্রামের খবর সংবাদপত্রে সে নিশ্চয় পড়েছে। লোকমুখেও শুনবে। মুরলি এতো সব না ভাবলেও স্বামীর পথ চেয়ে বসে আছে। গ্রামের মেয়ে হলেও মুরলি সামান্য লেখাপড়া জানে। খবরের কাগজ পড়তে পারে। সব দিন কাগজ হাতে পায় না। অনিয়মিতভাবে পড়লেও ভূমিকম্পের খবর কমবেশি জেনেছে। সব খবর বিশ্বাস করেনি। কিলারির খবরও অবিশ্বাস করেছিল। কিলারিতে না এলে আমার কথা বিশ্বাস করত না। এখনও পুরোপুরি করেনি। মাথা ঠাণ্ডা হলে হয়ত লাতুর

হাসপাতালে যেতে চাইবে। হাসপাতালে কেশবকে পাওয়ার সম্ভাবনা, মাথায় আসবে। লাতুর পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকতে হবে আমাকে। আমি থাকব। তারপর? সদাশিবকে খুঁজতে আমাকে যদি সোলাপুরে পাঠায়, তখন কী করব? আমার সঙ্গে মুরলিও সোলাপুরে যেতে চাইতে পারে।

কলকল করে চারপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির জল। অরিন্দমের মনে হচ্ছে, বাড়ির তলা দিয়ে পাতালগঙ্গা বয়ে চলেছে। মাটির ফাটল বেয়ে বৃষ্টির জল পাতালগঙ্গায় গিয়ে পড়ছে। জলস্রোতের এমন অদ্ভিম শব্দ অরিন্দম আগে শোনেনি। চাপা গলায় ভেংকট কথা বলে চলেছে। ভূমিকম্পের পরে মুরলিকে দু-একবার সোলাপুরে চিঠি লিখতে বলেছিলাম। লিখছি, লিখব করে শেষ পর্যন্ত লেখেনি। পোস্টকার্ড, অন্তর্দেশীয়, লেফাফা, বাড়িতে হয়ত হাতের কাছে পায়নি। আমাকেও কিছু বলেনি। লেফাফা চায়নি আমার কাছে। গ্রামদেশে চিঠি লেখার তেমন চল নেই। লেখাপড়া শেখা লোকও চিঠি লেখে না। মেয়েরা চিঠি লিখতে ভয় পায়। মুরলি হয়ত ভয়ে সদাশিবকে চিঠি লেখেনি। সোলাপুরে মুরলির চিঠি গেলে কিছু একটা খবর আসত। আমার দায়িত্ব কমত। ভয়ে গুটিয়ে থাকতাম না। সদাশিবের খবর আমি কী করে মুরলিকে দেব? খবরটা শুনে মুরলি কি বিশ্বাস করবে? মুরলি ভাবতে পারে, আমি বানানো গল্প শোনাচ্ছি। বদ মতলব আছে আমার। সদাশিবের খবর দেওয়ার আগে তর্লানির ঘটনা তাকে জানানো উচিত। কীভাবে জানাব? আমাকে সে পাষণ্ড ভাববে। আমার মনের ভেতরে কী চলছে, তাকে তো দেখাতে পারব না। সদাশিবের খবর তাকে না জানিয়ে আমার মরার উপায় নেই।

বৃষ্টির আওয়াজের সঙ্গে মিশে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভেংকটের কণ্ঠস্বর। ভেংকটকে অরিন্দম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। ঘন অন্ধকার জেঁকে বসছে। কোথাও আলোর ছিটেফোঁটা নেই। এই অন্ধকারে তিন-চার কিলোমিটার পথ ভেঙে কীভাবে কিলারি যাবে, অরিন্দম ভেবে পেল না। বৃষ্টিতে পিছল হয়েছে পথ। গ্রামের ভেতর দিয়ে গেলেও অন্ধকারে থানা, খোঁদল দেখা যাবে না। দূরত্ব কমাতে উপত্যকা, জঙ্গল পেরিয়ে কিলারি চক পর্যন্ত পেঁছানো সহজ নয়।

মাঝখানে আছে আধ কিলোমিটার গভীর খাদ। খাদের গা দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। দু-আড়াই ফুটের বেশি চওড়া নয় সেই পথ। পথ উপচে নিশ্চয় জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। পথ মসৃণ নয়। পথের নানা জায়গায় ভূমিকম্পে টিলা থেকে ছিটকে-পড়া পাথরের ছোট-বড় টুকরো জমে আছে। অন্ধকারে পা ফেলতে সামান্য ভুল হলে খাদে সেঁধিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারও কাছে একটা টর্চ নেই। অরিন্দমের পকেটে একটা দেশলাই বাক্স আছে। কাঠি প্রায় শেষ। দেশলাই কাঠি জেবলে দু'কিলোমিটার অন্ধকার পথ পেরনো সম্ভব নয়। শুকনো কাঠকুটো জড়ো করে মশাল বানানো যায়। পাহাড়ি পথটা মশাল জেবলে পেরিয়ে যেতে পারলে জঙ্গলের রাস্তায় বিশেষ অসুবিধে হবে না। বৃষ্টিতে ভাসন্ত গ্রামে শুকনো কাঠকুটো পাবে কোথায়? অন্ধকারে কী করে খুঁজবে সেসব? প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া অন্য ভয় আছে। শিকার ধরতে যারা অন্ধকারে ওত পেতে বসে আছে, তারা ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্পের চেয়ে ভয়ংকর। তাদের প্রহার প্রকৃতির মত উদাসীন নয়। তারা সর্বভুক, তারা নৃশংস, শিকারকে বাগে পেলে সব দিক থেকে ঝাঁঝরা করে দেয়। ঝড়বৃষ্টি, অন্ধকারের চেয়ে তাদের নিয়ে অরিন্দমের দুশ্চিন্তা বেশি। মুরলির মত যুবতী মেয়ে সঙ্গে আছে। মুরলি কুরূপা, রূগ্ণ নয়। তার চেহারায় আলগা চটক আছে। সোজা চোখে একবার দেখলে, দ্বিতীয়বার আড়চোখে তাকাতে হয়। তার লাবণ্য, তার শত্রু। অরিন্দম জানে শিকারিদের হাতে ক্যামেরা, মানিব্যাগ, ঘড়ি তুলে দিলে সে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। ভেংকটও তাই। টাকাপয়সা ছাড়া তাদের কাছ থেকে লুটেরার দল আর কিছু নেবে না। মুরলির বেলায় তেমন ঘটবে না। দুহাতের দু'গাছা সোনার রুলি, পাথর বসানো সোনার নাকছাবি খুলে দিয়ে মুরলি পার পাবে না। গয়না ছাড়াও তার কাছে লুট করার মত জিনিস আছে। সেটা তার শরীর। অন্ধকারে চোখ জেবলে বসে-থাকা কয়েকজন মানুষ তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। না, সেরকম কিছু ঘটবে না। অযথা সে ভয় পাচ্ছে। হাতঘড়িতে চোখ রাখল অরিন্দম। ঘড়ির ডায়ালটা দেখতে পেল না। চোখের সামনে বাঁ হাতের কব্জি তুলে ধরল। দুটো কাঁটা চিকচিক করছে। সংখ্যা পড়া যাচ্ছে না। চাপা

গলায় ভেংকট বলল, সদাশিব বেঁচেও থাকতে পারে। ভূমিকম্পের সময়ে সে হয়ত তলানিতে ছিল না। তলনি ত্রাণঅফিসে মৃতের তালিকায় তার নাম আমি দেখিনি। তালিকায় নাম না উঠলে দেখব কী করে? তালিকায় নাম তুলবে কে? তলানির ক'জন লোক সদাশিবকে চিনত? যারা চিনত, তাদের কেউ হয়ত বেঁচে ছিল না। বেঁচে থাকলে হাসপাতালে আজও শুয়ে আছে। দু-তিনশ করে মৃতদেহ, যখন একসঙ্গে চিতায় তুলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের সনাক্ত করার মত কেউ সেখানে ছিল না। কতজন অজ্ঞাতপরিচয় থেকে গেছে, কে জানে! সংখ্যায় তারাই বেশি। গ্রামের বাড়িগুলোতে সারা বছর আত্মীয়, কুটুম থাকে। ভূমিকম্পের রাতেও ছিল। গণপতিপুজোর শেষদিন পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখতে চেয়েছিল সরসী। আমি থাকিনি। জীবনে এটাই আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ। তলনিতে আরও দুদিন থাকলে, আত্মীয়-কুটুমদের সঙ্গে এক চিতায় জায়গা পেতাম। কয়েকশ আধপোড়া লাশের সঙ্গে আমাকেও বুলডোজার চালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত। কিলারি শ্মশানে, বুলডোজার চালানো আমি দেখেছি। বুলডোজার না চালিয়ে উপায় নেই। দু-তিনশ মৃতদেহ একসঙ্গে দাহ করা যায় না। সবগুলো সমানভাবে পোড়ে না। পেট্রল ঢেলে পোড়ালেও আধপোড়া থেকে যায়। কাঠ সাজিয়ে সেরকম চিতা বানাবার মত লোক কোথায়? তলানিতে গণচিতায় অজ্ঞাতকুলশীল যাদের পোড়ানো হয়েছে, তাদের পরিচয় কখনও জানা যাবে না। তাদের কেউ সদাশিব নয়, এটাই ধরে নিতে হবে। তলনিতে আমি থাকলেও তাই হত। অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদের একজন হয়ে যেতাম। সদাশিবের খবর পেটে চেপে রেখে ছটফট করতে হত না। সদাশিব মারা গেছে জেনেও মুখ বুজে থাকতে হচ্ছে।

বাতাসের মত ফিসফিস করে ভেংকট কথা বলছে। তাকে দেখতে পাচ্ছে না অরিন্দম। বলা ভুল হল। অন্ধকারের মধ্যে একতাল ঘন অন্ধকারের মত তাকে দেখতে পাচ্ছে। লোকটাকে যত ছাপোষা ভেবেছিল, তা নয়, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। লেখাপড়া জানে। গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তার বিবরণের মধ্যে খবর করার মত অনেক তথ্য অরিন্দম পেয়েছে। সংবাদপত্রে রবিবারের পাতায় বড় প্রতিবেদন

লেখার হুকুম হলে, ভেংকটকে প্রধান চরিত্র করে অনায়াসে সুখপাঠ্য একটা রচনা লিখে ফেলা যায়। সবচেয়ে আগে লাতুর পৌঁছানো দরকার। তারপর কলকাতার অফিসে টেলিপ্রিন্টারে খবর পাঠানো, কৌশিকীকে ফোন করা, এবং তারপর, অরিন্দম আর ভাবতে পারছে না। কোউটি নামে এক অচেনা গ্রামে, মৃত দেবদত্ত পিল্লাইয়ের মাটিতে মিশে যাওয়া বাস্তুর অন্ধকার চাতালে বসে তার মনে হল, মহেঞ্জোদারোর গর্ভে ফিরে গেছে। সেখানে স্থির হয়ে আছে প্রত্ন-প্রস্তরযুগ, পাঁচ হাজার বছরের অন্ধকার। মাটির তলা দিয়ে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে সিন্ধুনদীর জল। চারপাশে ছড়িয়ে আছে মাটির বাসন, লিপি খোদাই করা পাঞ্জা, মেয়েদের গয়না, দৈনন্দিন জীবনের নানারকম সরঞ্জাম। সময় এক মুহূর্ত এগোয়নি। মানচিত্র নেই, দেশ নেই, শহর, জনপদ গড়ে উঠছে আর ভেঙে পড়ছে। অনাগত পাঁচ হাজার বছরের জঠরে পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, কৌশিকী, দোদুলের আভাস পর্যন্ত জাগেনি। দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে কাচপোকার মত ভেসে আছে ছোট একটা গ্রাম, গ্রামের ভেতরে তিনটে প্রাণী। গ্রামের নাম কোউটি। প্রাণীরা হল, মুরলি, ভেংকট আর সে, অরিন্দম দত্ত।

ভেংকটকে দেখার চেষ্টা করল অরিন্দম। অন্ধকারের ভেতরে ঘনীভূত অন্ধকারের পুঁটলিটা দেখতে পেল না। মুরলির দিকে নজর করল। অন্ধকার সেখানে গাঢ়তর হয়েছে। মুরলির পাশে গিয়ে বসেছে ভেংকট। ফিসফিস করে কথা বলছে। মুরলির সাড়া নেই। ভেংকট কি সদাশিবের মৃত্যুসংবাদ মুরলিকে শোনাচ্ছে? আজ রাতে তাহলে কোউটি থেকে ফেরা যাবে না। ভেংকটের দু-একটা কথা কানে আসতে অরিন্দম স্বস্তি পেল। মুরলিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ভেংকট। মুরলির মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। কিলারি রওনা হওয়ার আগে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে চাইছে। মুরলি না উঠলে কলকাতার পত্রকারবাবু বিপদে পড়বে, বোঝাচ্ছে। অচেনা যে মানুষটা গাড়িতে দু'জনকে তুলে কিলারিতে নিয়ে এল, লাতুরে না গিয়ে তাদের সঙ্গে কোউটি চলে এল, তার অসুবিধের কথা মুরলির ভাবা উচিত। না ভাবলে অপরাধ হবে। পরে, নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে হবে। মুরলির এখনই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। হাত, পা ছেড়ে

দিয়ে বসে না থেকে উঠে দাঁড়ানো দরকার।

ভেঙ্কটের টুকরো টুকরো কথা শুনে, অরিন্দমের মনে হল, মানুষটা আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। সাদামাঠা চেহারায় অন্যরকম মানুষ। মৃত্যুর আবহে বাস করেও বোধবুদ্ধি বজায় রেখেছে। ভূমিকম্পে বৌ মারা গেছে, নবজাত মেয়ে মারা গেছে, তবু ভেঙে পড়েনি। অরিন্দমের হঠাৎ মনে হল, ভেঙ্কট স্বাভাবিক আছে তো? তা আছে তবে গভীর ঝোঁকের মাথায় আছে। ঝোঁক না বলে নেশাও বলা যায়। মুরলির নেশায় ভেঙ্কট বুঁদ হয়ে আছে। সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরে পড়লেও টের পাচ্ছে না।

পাঁচ

দিল্ কো চির ডালুঙ্গি

(ইলা অরুণের গান)

বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে একনাগাড়ে। অন্ধকার পোড়ো বাড়ির আনাচে কানাচে বাতাস ঢুকে ভুতুড়ে শব্দ করছে। সাতটার মধ্যে কিলারি ফেরার সুযোগ নেই। অনেক আগে সাতটা বেজে গেছে। দেবদত্ত পিল্লাই-এর ভিটে থেকে এখন বেরনো দরকার। বিদ্যুতের আলোয় মুরলির মুখ মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছে অরিন্দম। ভেঙ্কটকেও দেখছে। মুরলির মুখোমুখি বসেছে ভেঙ্কট। তার মুখে কথা নেই। মুরলির ওঠার জন্যে সে প্রতীক্ষা করছে। অরিন্দম টের পাচ্ছে, ভূমিকম্পের প্রতিবেদন তৈরির যে ছক চব্বিশ ঘণ্টা আগে তৈরি করেছিল, তা বদলে যাচ্ছে। আজ কত রাতে লাতুর পৌঁছবে, সে নিজেও জানে না। লাতুর থেকে কলকাতায় খবর পাঠানোর সময় পাবে কিনা, সন্দেহ। কাল ভোরে সস্তুর, লিম্বারা, এলোন্ডি, হোলি, তুষিগড় এবং আরও কয়েকটা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। যাওয়া হবে কিনা, এখন সন্দেহ জাগছে। বেজওয়াড়া থেকে বাসে হায়দরাবাদ পৌঁছে গত সন্ধেতে নাগেশ্বর রেড্ডির দপ্তরে চলে গিয়েছিল। নাগেশ্বরের সঙ্গে কথা বলে

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের তালিকা, সেখানে যাওয়ার পথনির্দেশ, গ্রামগুলোর বৈশিষ্ট্য, ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান লিখে নিয়েছিল। সস্তুরে আটশ গ্রাম-বাসীর সাতশ জন মারা গেছে। ছেলেদের খেলার মাঠে মৃতদের গণকবর দেওয়া হয়েছে। লিম্বারা গ্রামে সূর্যমুখী খেতের পাশে গণচিতার সামনে চব্বিশ ঘণ্টা বসে আছে বাদামি রঙের একটা গরু। সংবাদপত্রে গরুটার ছবি বেরিয়েছে। মৃত এক গ্রামবাসীর গরু। মনিবের আশায় তার চিতার পাশে সারাক্ষণ বসে আছে। অনেকে দেখতে যাচ্ছে গরুটাকে। ফলমূল খেতে দিচ্ছে। ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর করতে এসে খুঁটিনাটি নানা তথ্য নাগেশ্বরের কাছ থেকে অরিন্দম জেনে নিয়েছিল। সন্ধের পরে বানজারা হিলস্-এর এক অতিথিভবনে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল নাগেশ্বর। অতিথি-ভবনে ঘরের ব্যবস্থা নাগেশ্বরই করে রেখেছিল। পুরনো বন্ধুর জন্যে যা করার সব করেছিল এবং নিখুঁতভাবে পর্যটনসূচি মেনে চলতে বলেছিল। অরিন্দম জানত, দুটো জেলা ঘুরে দেখতে হলে রুটিনের বাইরে যাওয়া চলবে না। সে-ও রুটিন মেনে চলতে চেয়েছিল। কিন্তু বিপন্ন দুজন মানুকে সাহায্য করতে গিয়ে পর্যটনসূচি এভাবে এলোমেলো হয়ে যাবে, ভাবেনি। কোউটি ছেড়ে এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার। লাতুর থেকে কলকাতায় খবর পাঠানোর চেয়ে আরও জরুরি কাজ সেখানে আছে। কৌশিকীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে হবে। তার ফোনের জন্যে জেগে থাকবে কৌশিকী। কৌশিকীর গর্ভে সুষুপ্তিতে ডুবে থাকা এক শিশু হয়ত অনুভব করবে মায়ের উদ্বিগ্ন হৃৎস্পন্দন। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এক জনপদ থেকে শিশুটির কানে পৌঁছে যাবে তার বাবার গলার শব্দ। জন্মদাতার কণ্ঠস্বর সে কি চিনতে পারবে? বাবার ডাকে মায়ের অন্ধকার গর্ভে সে কি জেগে উঠবে? অরিন্দম টের পেল, ত্রিশ হাজার মৃত্যুর চেয়ে একটি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার চিন্তা তাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরছে। কলকাতা ছাড়ার আগেই এটা শুরু হয়েছে। কুয়াশার মত অনিশ্চয়তা মনে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখে কিছু না বললেও অস্বস্তি ছিল মনের ভেতরে। নানা কথায় বিষয়টাকে কৌশিকী হালকা করে দিতে চাইছিল। ডাক্তার-নির্ধারিত তারিখটা আসতে এক মাস দেরি, অরিন্দমকে ট্রেনে তুলতে এসেও শুনিয়েছিল। তার সাতদিনের

অনুপস্থিতিকে কৌশিকী গুরুত্ব দিচ্ছিল না। স্বাভাবিক থাকতে চেয়েও মাথার মধ্যে কষ্টকর চাপ অনুভব করছিল অরিন্দম। ট্রেনে না উঠে স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। দোদুল পাশে না থাকলে হয়ত তাই করত। পাঁচ বছরের ছেলের জন্যে পারেনি। বাবাকে ঘরকুনো ভাবতো দোদুল। ফাঁকিবাজ ভাবা অসম্ভব ছিল না। তার হাসির খোরাক হতে চায়নি। ট্রেনে উঠতে বাধ্য হয়েছিল।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা গায়ে এসে লাগতে অরিন্দম শীত অনুভব করল। অন্ধকার যত বাড়ছে, শীতল হচ্ছে আবহাওয়া। বৃষ্টির জন্যেও ঠাণ্ডা ঘন হচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কড়কড় করে বাজ পড়ল। কলকাতা থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে মহারাষ্ট্রের এক অন্ধকার গ্রামে বসে স্ত্রী, সন্তানের চিন্তায় অরিন্দম অস্থির হয়ে উঠছে। ভূমিকম্পে তছনছ গ্রামের অসংখ্য গহ্বর, ফাটল থেকে কুণ্ডলী পাকানো মৃত্যুর ধোঁয়া বেরিয়ে তাকে ঘিরে ধরছে। কোটটি থেকে ফিরে যেতে পারবে তো? নাগেশ্বরের পথনির্দেশ মেনে চলা উচিত ছিল। ঝোঁকের মাথায় ভ্রমণসূচি পাল্টে কিলারিতে এসে ভুল করেছে। ভূমিকম্পের প্রতিবেদন পাঠানোর কাজে এসে অন্য ছকে জড়িয়ে গেছে। তার স্ত্রী, সন্তান, পরিবার, পেশা থেকে আলাদা এই ছক। দুজন অচেনা মানুষ, কয়েক ঘণ্টায়, এই ছকে তাকে জড়িয়ে দিয়েছে। সহজে এখান থেকে বেরনো যাবে না। পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে বারবার এরকম ঘটেছে। যা করার কথা ভেবেছে, তার এক-দশমাংশ করতে পারেনি। কাজের জন্যে জড়ো করা উপকরণ, অকাজে খরচ করেছে। না, ঠিক বলা হল না। জীবনের বিশেষ মুহূর্তে টের পেয়েছে, পুরোপুরি অকাজ বলে কিছু নেই। কাজ আর অকাজ জুড়ে জীবন গড়ে ওঠে। কাজের চেয়ে, অকাজের গুরুত্ব কম নয়। মায়ের ছেলেবেলার সখী, নন্দিতামাসির মেয়ের বদলে কৌশিকীকে যখন সে বিয়ে করল, আত্মীয়দের অনেকে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। মা সাতদিন কিছু খায়নি। নন্দিতামাসির কাছে লজ্জায় কাটা গিয়েছিল মায়ের মাথা। ছেলে, মেয়েকে নিয়ে দুই সখীতে যে একটা চুক্তি আছে, আভাসে জানতে পেরেও অরিন্দম পাত্তা দেয়নি। তার পছন্দের মেয়ে কৌশিকী।

তিন-চার বছর কৌশিকীর সঙ্গে সে মেলামেশা করছে। কৌশিকী ছাড়া কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারেনি। বিয়ের পরে বেশ কিছুদিন মা, ছেলেতে বাক্যালাপ ছিল না। কৌশিকীকেও মা এড়িয়ে চলত। তারপর আট বছর কেটে গেছে। কৌশিকী এখন শাশুড়ির চোখের মণি। পুত্রবধূ ছাড়া মা অন্ধকার দেখে। বধূনির্বাচনে অরিন্দমের ভূমিকাকে সেদিন যারা অকাজ ভেবেছিল, আজ তারা অন্য কথা বলে। অরিন্দমের পছন্দে তারিফ করে। কৌশিকীকে বিয়ে করা যে তার জীবনের সেরা কাজ, এমন মন্তব্য করে কেউ কেউ। নন্দিতামাসির সেই মেয়েও দাম্পত্যজীবনে সুখী হয়েছে। নন্দিতামাসি নিশ্চয় এখন ভাবে, যে অরিন্দমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ভেস্তে গিয়ে মঙ্গল হয়েছে। নন্দিতামাসির মেয়ের বদলে কৌশিকীকে বিয়ে করার আগে তার মনে অনিশ্চয়তা ছিল। নন্দিতামাসির পরিবারকে যতটা জানত, কৌশিকীর পারিবারিক পরিচয় সেভাবে জানত না। তার জীবনে কৌশিকী ছিল আগন্তুক। সে শুধু কৌশিকীকে চিনত। তাকে ভাল লেগেছিল, ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তার সঙ্গে অপরিচিত সেই মেয়ে, একদিন জীবনসঙ্গিনী হয়ে গেল। অরিন্দমের মনে হয়, জীবনের নকশা তৈরিতে বেশিরসদ আসে অচেনা উৎস থেকে। চেনা পরিচিতদের চেয়ে অচেনা মানুষজন, জীবনকে বেশি সম্পূর্ণতা দেয়।

নাগেশ্বরের দেওয়া পথনির্দেশ পাল্টানোর যুক্তি মনে মনে সাজালেও অরিন্দম শান্তি পাচ্ছে না। মহারাষ্ট্রের অপরিচিত এক গ্রামে বসে আত্মীয় বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে তিলে তিলে গড়া সংসারের ছবি। চেনাকে বাদ দিয়ে অচেনার দাম নেই। চেনা আর অচেনা মিলে গড়ে তোলে মানুষের যাবতীয় সম্পর্ক। কথাটা মনে হতে ভেঙ্কট, মুরলির দিকে অরিন্দম তাকাল। চাতাল জুড়ে অন্ধকার। চাতালের শেষ মাথায় ঘর। ঘর ভেঙে পড়েছে। সেখানে আরও বেশি অন্ধকার। ভেঙ্কট কখন চুপ করেছে, অরিন্দম খেয়াল করেনি। বৃষ্টির শব্দ, নালা, ফাটলে বয়ে যাওয়া জলের কলকল আওয়াজে ভেঙ্কটের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তার সব কথা অরিন্দম শুনতে পাচ্ছিল না। ক্লান্তিতে অবশ লাগছিল শরীর। নিজের চিন্তায় ডুবে কখন যেন

একা হয়ে গিয়েছিল সে। তার কানে, ভেঙ্কটের নিচু গলার কথা, ঢেউ তুলছিল না। তারপর কতটা সময় কেটেছে, অরিন্দম হদিশ করতে পারল না। অনুভব করল, অনেকটা সময় পার হয়েছে। আরও ঘন হয়েছে অন্ধকার। অন্ধকার চাতালে দু'জন মানুষকে দেখা না গেলেও তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। বৃষ্টি আর বাতাসের আওয়াজ ঢুকল কানে। অন্ধকারের দিকে স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে তার সন্দেহ হল, ভেঙ্কট, মুরলি চাতালে নেই। চাতাল ফাঁকা। মুরলিকে নিয়ে ভেঙ্কট সরে গেছে। কোথায় গেল? বাড়ির বাইরে যায়নি। সদর আগলে সে বসে আছে। বাড়ি থেকে কেউ বেরলে, তার চোখে পড়ত। অন্ধকার যত ঘন হোক, তার নজর এড়িয়ে দু'জন মানুষ বাড়ির বাইরে যেতে পারত না। দু'জোড়া পায়ের শব্দে অন্ধকার কাঁপত, হালকা ঢেউ উঠত বাতাসে। দু'জনে নিশ্চয়ই চাতালের লাগোয়া ঘরে ঢুকেছে। সে ঘর নিরাপদ নয়। ঘরের আধখানা ছাদ ধসে পড়েছে। মেঝের একাংশ মাটিতে ডুবে গেছে, বাকি মেঝে চৌচির। মাটির নিচে যে কোনও সময়ে তলিয়ে যেতে পারে। চাতাল ছেড়ে মুরলিকে নিয়ে ভেঙ্কট সেখানে গেল কেন? অরিন্দমের কথা ভেবে, একটু আগে কোউটি থেকে মুরলিকে বার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ভেঙ্কট। তার অনুরোধ, উপদেশের কিছু অংশ অরিন্দম শুনেছে। মুরলি চুপ করে ছিল। চাতাল থেকে কখন দু'জন চলে গেছে, অরিন্দম টের পায়নি। মুরলিকে এখন ভেঙ্কট কী শোনাচ্ছে? তলনিতে গণচিতায় সদাশিবের হারিয়ে যাওয়ার খবর বলছে না তো? কোউটির এই বাড়িতে কেশবের সমাধি হওয়ার আশঙ্কার কথা কি বলছে? ভূমিকম্পের অচেনা আবহে কি বদলে গেছে ভেঙ্কট, মুরলির সম্পর্ক? তারা এখন কোথায়? চাতাল ছেড়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকে বিপদে পড়েনি তো? মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে ঘরের ভেতরে। চোরাবালির মত ঘরের মেঝে যে কোনও মুহূর্তে তাদের গিলে নিতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, চাতালও নিরাপদ নয়। আচমকা ভয়ে অরিন্দমের শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। মেঝেসুদ্ধ তলিয়ে যাবে নাকি? চাতাল ছেড়ে এখনই বাড়ির বাইরে গিয়ে সে দাঁড়াতে চায়। বৃষ্টি কমে এসেছে। বিদ্যুতের

আলোয় অরিন্দম দেখল, চাতাল খালি, ভেঙ্কট, মুরলি চাতালে নেই। দু'জনে নিশ্চয় ঘরে ঢুকেছে। ঘরের দরজার একটা পাল্লা খসে গেছে। অন্যটা আছে কিনা, অরিন্দম দেখেনি। চাতালের শেষ মাথায় ঘরটাকে গুহার মত দেখাচ্ছে। ঘরের কাছে সাবধানে এসে দাঁড়াল অরিন্দম। দরজার বাইরে থেকে ঘরে উঁকি দিল। পাহাড়ি সুড়ঙ্গের মত নিকষ অন্ধকার ঘর। ঘরের ভেতরে সাড়াশব্দ নেই। কান খাড়া করে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে অরিন্দম টের পেল, ঘরে মানুষ আছে। তারা কথা বলছে না, তাদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, শব্দহীন ঢেউ-এর মত তারা বয়ে যাচ্ছে। অরিন্দম দাঁড়িয়ে গেল। তার নড়ার শক্তি নেই। শোকে বোবা হয়ে যাওয়া মুরলিকে কী মন্ত্রে ভেঙ্কট জাগাল, সে বুঝতে চায়। চাপা গলায় ভেঙ্কট বলল, পত্রকারবাবুজি অপেক্ষা করছে। আমাদের রওনা হওয়া উচিত।

ফিসফিস করে মুরলি কী বলল, অরিন্দম শুনল না। ভেঙ্কট বলল, আজ নয়। এখানে নয়। বড় খারাপ জায়গায় আমরা এসে গেছি। আগে এখান থেকে বেরনো দরকার। তোমাকে আরও কিছু কথা বলার আছে।

মুরলি ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। গলা নামিয়ে ভেঙ্কট বলল, বাড়ি ফিরে তুমি যা চেয়েছ, দেব। সামনের বছর খামারে সূর্যমুখী ওঠার সময়ে আমাদের ঘরে একটা বাচ্চা আসবে।

ঘরের অন্ধকার কেঁপে উঠল। মুরলিকে নিয়ে ভেঙ্কট চাতালে ফেরার আগে দরজা থেকে অরিন্দম সরে গেল। মুরলিকে অনেকটা স্বাভাবিক করে তুলেছে ভেঙ্কট। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অরিন্দমের পা লেগে কাচের বোতল ছিটকে সরে গেল। কাচ ভাঙল ঝনঝন করে। খালি তিনটে মদের বোতলের একটা ভাঙল। বৃষ্টি ধরে আসছে। মন্দগতি হয়েছে বাতাস। বোতল ভাঙার আওয়াজ, মুরলির কানে না গেলেও ভেঙ্কট নিশ্চয় শুনেছে। আর কেউ কি শুনতে পেয়েছে? মদের বোতল যারা এনেছিল, তাদের কেউ? ঝড়, বৃষ্টিতে তারা এখন কোথায়? তারা নিশ্চয় কোটটিতে তিন অনাহূত অতিথিকে দেখেনি। বেওয়ারিশ এই ভূখণ্ডের মালিকদের নজর মুরলি এড়াতে না পারলে তার বিপদ ঘটবে। নারীসঙ্গহীন

লুটেরারা মুঠোর মধ্যে একজন তাজা স্ত্রীলোক পেলে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। অন্ধকার ঘরে মুরলিকে নিয়ে ভেংকট কী করছে? চাতাল ছেড়ে সে ঘরে ঢুকল কেন? কখন ঢুকল? মুরলিকে কীভাবে নিয়ে গেল? চাতালের চেয়ে ঘর বেশি অন্ধকার নয়। গোপনীয়তা, দু'জায়গায় সমান। তবু চলচ্ছক্তিহীন মুরলিকে অন্ধকার থেকে আরও গাঢ় অন্ধকারে ভেংকট কেন নিয়ে গেল? চাতাল থেকে দূরত্ব বাড়াতে হয়ত জায়গা বদল করেছে। সেটাই সম্ভব। অরিন্দম বিরক্ত বোধ করল। বৌ, মেয়ে মারা দাওয়ার দু'সপ্তার মধ্যে একজন পুরুষ কীভাবে এমন স্ত্রীসঙ্গলোলুপ হয়? হয়ত লোলুপতা নয়, অন্য কারণ আছে। মুরলির সঙ্গে ভেংকটের রফা হয়ে গেছে। আগামী সূর্যমুখীর মরসুমে মুরলির মা হওয়ার সাধ, ভেংকট মিটিয়ে দেবে। অন্ধকার ঘরে, নিভৃতে মুরলিকে কথা দিয়েছে। কথাটা কি মুরলি আদায় করে নিল? স্বামী, ছেলে নেই, মুরলি কি বুঝে গেছে? ভেংকটের হাবভাব দেখে মুরলি হয়ত কিছু অনুমান করেছে। ভেংকট যে নিজে বলেনি, এবিষয়ে অরিন্দম নিঃসন্দেহ।

চোখে না দেখেও ঘর থেকে মুরলিকে নিয়ে ভেংকট বেরিয়েছে, অরিন্দম টের পেল। অন্ধকারে তাকে খুঁজছে ভেংকট।

ভেংকট সামনে আসতে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, ঘরে ঢুকলে কখন?

ভেংকট চুপ। অরিন্দম বলল, এবার ফিরতে হবে।

অরিন্দমের সামনে দাঁড়াল ভেংকট। পাশে মুরলি। কালো পাথরের মূর্তির মত দেখাচ্ছে দুজনকে। ভেংকট বলল, মুরলিকে খুঁজতে ঘরে ঢুকেছিলাম।

মুরলির ঘরে ঢোকার কারণ অরিন্দম জানতে চাইল না। ভেংকট বলল, কেশবের গলা শুনে মুরলি ঘরে ঢুকেছিল।

ভেতরের কোনও ঘর থেকে বাসন পড়ার শব্দ ভেসে এল। নিস্তব্ধ বাড়ি ধাতব আওয়াজে কেঁপে উঠল। ভেংকট, মুরলির শ্বাস পড়ছে না। অরিন্দমের মনে হল, কেশব না হলেও অন্ধকার ঘরে মুরলিকে কেউ ডেকেছিল। সে ভূতপ্রেত নয়, মানুষ। সঙ্গীসাথী নিয়ে সে সেখানে আছে। অরিন্দম অনুভব করল, তাকে ঘিরে ধরছে ভূমিকম্পে মৃত ত্রিশ হাজার মানুষ। ফিসফিস করে তারা কিছু

বলছে। অরিন্দম বুঝতে পারছে না তাদের কথা। বৃষ্টি থামলেও জলের কলকল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সদর দরজার দিকে পা বাড়াল অরিন্দম। কিলারিতে গাড়ি নিয়ে মজিদ অপেক্ষা করছে। ইলা অরুণের ক্যাসেট শুনছে নিশ্চয়। না-ও শুনতে পারে। তার দেরি দেখে মজিদ হয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কানের কাছে মুখ এনে বাতাস জিজ্ঞেস করল, কতগুলো মৃত্যু তুমি দেখেছ অরিন্দম?

ছয়

হায় রে গুলাবি, রাত গুলাবি

(ইলা অরুণের গান)

অন্ধকার, পাথুরে রাস্তা দিয়ে কিলারিতে ফিরছে তিনজন। উঁচু বাঁধের মত রাস্তা। বিকেলে যে পথে কোউটি এসেছিল, রাতে সেই পথে ফিরতে অরিন্দম সাহস পায়নি। দেড়-দু'কিলোমিটার বাড়তি হাঁটতে হবে জেনেও সদর রাস্তা ধরে ফিরছে। কিছুটা এগিয়ে টের পেল, রাস্তা পাল্টে লাভ হয়নি। মেঠো পথের মত এ রাস্তাও দুর্গম। পদে পদে উঁচিয়ে আছে পাথরের খোঁচা। সাবধানে পা না ফেললে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাস্তা ফেটে গিয়ে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। জল থৈথৈ করছে সেখানে। বিদ্যুতের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা দেখতে পেল অরিন্দম। অচেনা রাস্তা। চেনা পথ ছেড়ে অচেনা রাস্তায় এসে মনে হল, ভুল করেছে। চেনা, অচেনাতে এখানে অবশ্য বিশেষ তফাত নেই। সব মিলে এক বিরাট মৃত্যুপুরী। দু'পাশের অন্ধকার মাঠ, খেত, জঙ্গল, টিলার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে গ্রামের সদর রাস্তা। মেঠো পথের মত এ রাস্তাও জনমানবহীন, স্তব্ধ। অচেনা রাস্তায় বেশি অসুবিধে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দুমুখো তিনমুখো হয়ে যাওয়া সড়কের কোনটা কিলারি গেছে, আন্দাজে ঠিক করতে হচ্ছে। ঝিপ-ঝিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কালচে গোলাপি মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। পাশাপাশি তিনজন হাঁটার সুযোগ থাকলেও অরিন্দম দু'পা এগিয়ে

আছে। পেছনে ভেঙ্কট, মুরলি। মুরলির হাত ধরে আছে ভেঙ্কট। চাপা গলায় অরিন্দমকে শোনাচ্ছে ভূমিকম্পকবলিত মানুষের মৃত্যুর ধারাবিবরণ। তার কণ্ঠস্বরে ভয় আর সতর্কতা। কথা বলে অচেনা কারও নজরে পড়তে চায় না। ভেঙ্কটের মুখ থেকে ক্রমাগত মৃত্যু-বিবরণ শুনে অরিন্দমের গলা শুকিয়ে গেছে। বারবার মনে পড়ছে কৌশিকী, দোদুলের মুখ। কৌশিকীর গর্ভে যে শিশুটি পৃথিবীতে আসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সে ঠিক আছে তো? অরিন্দমের বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। নিজের দেখা মৃত্যুর ঘটনা-গুলো মনে পড়ছে। মৃত্যুর কথা শুনলে, দূরে ফেলে আসা প্রিয়জনকে কেন মনে পড়ে? তাদের কথা ভাবলে কেন ফিরে আসে মৃত্যুর স্মৃতি? রাস্তার ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছ থেকে শকুনছানা ডেকে উঠল। শিশুর কান্নার মত আওয়াজ। উদাসীনভাবে মানুষের দুর্গতির কাহিনী, ভেঙ্কট শুনিয়ে চলেছে। বৌ, মেয়ের জীবন্ত সমাধির ঘটনাকে ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যুর মোড়কে পুরে ফেলেছে। মুরলিকে না শুনিয়ে চাপা গলায় ভেঙ্কট বলল, পেটসাংভি থেকে খবর পেয়েছি মুরলির দিদি পার্বতী, তার স্বামী যশপাল সূর্যবংশী, তিন ছেলেমেয়ে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। চারজনই মারা গেছে। খবরটা মুরলিকে বলিনি। কীভাবে বলব? মা, মাসি বলে তাকে ডাকার মত কেউ নেই, একথা জানাই কী করে?

ভেঙ্কট চুপ হয়ে গেল। অরিন্দম টের পেল, তার মত ভেঙ্কটও বুঝতে পেরেছে, পেছনে ফেউ লেগেছে। কিলারি থেকে কোর্টটি পর্যন্ত তারা ছায়ার মত আটকে আছে। দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়িতেও তারা ছিল। হয়ত সেখানে তাদের ডেরা। মদের খালি বোতল দেখে অরিন্দম বুঝেছিল, বাড়িটা নিরাপদ নয়। বাসনের আওয়াজে পাকাপোক্ত হয়েছিল সন্দেহ। তারা আশপাশে আছে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে নজর করছে। সুবিধেমত জায়গায় শিকার ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অন্ধকার রাস্তায় ভূতের ভয়ে রাম নাম জপ করার মত মৃত্যুকাহিনী বলে যাচ্ছে ভেঙ্কট। বাতাসে মৃত্যুর গন্ধের সঙ্গে মৃত্যুর পায়ের শব্দ, অরিন্দম শুনতে পাচ্ছে। ফিসফিস করে ভেঙ্কট বলল, ধনরাজ কোনেকেও দাদু, বাবা, কাকা বলে ডাকার কেউ নেই। কিলারি ত্রাণশিবিরে ধনরাজের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে দেখেও

আমি সেখানে যাইনি। ভয় পেয়েছি। ধনরাজকে মুরলি চেনে না। তলনিতে আমার শ্বশুরবাড়ির উল্টোদিকে থাকত ধনরাজ। বয়স সত্তর। ধনরাজের পরিবারের সবাই, চোদ্দজন, মারা গেছে। বেঁচে আছে শুধু ধনরাজ একা। কিলারি ত্রাণশিবিরে তাকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে কথা বলার মধ্যে আমার দিকে সে একবার তাকিয়েছিল। বোধহয় চিনতে পারেনি। না চিনে ভাল হয়েছে। আমি কথা বলিনি। কথা বললে, মানুষটার পরিচয় মুরলি জানতে চাইত। তলনিতে সদাশিব দেশপাণ্ডের যাওয়ার কথা জানাজানি হয়ে যেত। মুশকিলে পড়ে যেতাম। ধনরাজের খবর আপনার কাছেও জানতে চাইনি। ত্রাণশিবিরের এক কর্মীকে আড়ালে ডেকে ধনরাজের দুর্দশার কাহিনী শুনলাম। পৃথিবীতে আত্মীয়, জ্ঞাতি বলতে মানুষটার কেউ থাকল না। সত্তর বছর বয়সে পরিচয়-হীন একজন মানুষ আকাশ থেকে যেন খসে পড়েছে।

অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতে রাস্তার বাঁ পাশে সূর্যমুখীর খেত, ডানদিকে পাথুরে ফাঁকা মাঠ, অরিন্দম দেখতে পাচ্ছে। প্রচুর সূর্যমুখী ফলেছে এই মরসুমে। ফসল কেটে খামারে তোলার লোক নেই। বৃষ্টিতে পচন ধরছে সূর্যমুখীতে। বৃষ্টির জল বসে, মাটি চাপা পড়া মানুষগুলোকে মাটির আরও গভীরে ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে। তাদের দেহ, মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা যাবে না। মৃত্যু নিয়ে ভাবতে না চাইলেও চিন্তাটা মাথায় এসে যাচ্ছে। ত্রিশ হাজার মৃত্যুর চেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে নিজের দেখা মৃত্যুঘটনা-গুলো। বাড়ির জন্যে বুকটা হু-হু করছে। ভেঙ্কট কী ভাবছে? ত্রিশ হাজার মৃত্যু, মগজে পুরে সে কি আত্মীয়স্বজনের জন্যে দুশ্চিন্তা করছে? বোধহয় না। মুরলির চিন্তায় সে মজে আছে। মুরলির গায়ে মৃত্যুর ছায়া পড়তে দেবে না। ভেঙ্কটের হাবভাব কিছুটা হেঁয়ালির মত লাগছে। গল্পের মত করে সে শোনাচ্ছে মৃত্যুবিবরণ। ঘটনাগুলো যেন তার জীবনের নয়, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার কাহিনী। বিদ্যুতের আলোয় অরিন্দম দেখল সামনে রাস্তা তিনভাগ হয়ে গেছে। চৌমাথা, তেমাথা আগে দুবার পেরিয়ে এসেছে। সূর্য দেখে পশ্চিমদিকের যে ধারণা সন্ধেতে হয়েছিল, সেটা মাথায় রেখে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটছে। কোউটির উত্তরপশ্চিমে কিলারি। নিস্তব্ধ অন্ধকার

পথ। পথ পিছল। কিলারিতে পুলিসচৌকির সামনে যে জিপ-গাড়িটা বিকেলে দেখেছে, সেটা নিশ্চয় টহলে বেরয়। জিপের হেডলাইটের আলো এই অন্ধকারে যদি একবার দেখতে পেত! কথাটা ভেবে লম্বা শ্বাস ফেলল অরিন্দম। দিনে জিপ নিয়ে টহল দিলেও রাতে এই মহাশ্মশানে পুলিস বেরবে না। সন্ধের পর গায়ে গা লাগিয়ে ছাউনির ভেতরে তারা নিশ্চয় বসে থাকে। সারা রাত ভূত দেখে, আর কাল্পনিক ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। লুটেরা ঠেকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিত্যক্ত এই গ্রামে অন্ধকার রাতে কলকাতার এক সাংবাদিককে বাঁচাতে কেউ আসবে না। তেমাথার মোড়ে দাঁড়াল অরিন্দম। ভেঙ্কট, মুরলি খানিকটা পেছিয়ে গেছে। অন্ধকারে তাদের দেখার চেষ্টা করল। দুজন বোধহয় দাঁড়িয়ে গেছে। কিছু একটা ঘটেছে। ভেঙ্কট যে মৃত্যুকাহিনী শুরু করেছিল, তা পুরোটা অরিন্দম শোনেনি। কানে তালা লেগে গেছে তার। মাথা ভনভন করছে। খিদে পেয়েছিল এক সময়। এখন মরে গেছে। অবসাদ ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে। ভেঙ্কটের দু'চার কথা শুনে ঘটনাটা অরিন্দম বুঝে গিয়েছিল। ভেঙ্কটের এক ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল নীলনাগ তালুকের ফতেচিঞ্চোলি গ্রামে। বিয়ের দু'দিন আগে ভূমিকম্পে সম্ভাব্য ভাগ্নীজামাই মারা গেছে। খবর জানার পরে ভেঙ্কটের দিদির বাড়িতে কান্নার ধুম পড়ে যায়। ভাগ্নীর হয়ত আর বিয়ে হবে না। ছেলে পাবে কোথা থেকে? বিয়ের চব্বিশ ঘণ্টা আগে যে মেয়ের নির্ধারিত বর,জ্যান্ত কবরস্থ হয়, কে তাকে বিয়ে করবে? দেশগাঁয়ে এ খবর চাপা থাকে না। মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় লগ্নভ্রষ্টা, অভিশপ্ত মেয়ের খবর। ভূমিকম্পে বিবাহযোগ্য মেয়েও কম মারা যায়নি। তবে যে কোনও অবস্থাতে বিয়ের পাত্রী পাওয়া যায়। ছেলে পাওয়া মুশকিল। কানা, খোঁড়া, পঙ্গু, অপদার্থ ছেলেরও বৌ জুটে যায়। কিন্তু অতি বড় ঘরনী হওয়ার মত গুণী মেয়ে বর পায় না।

ভাগ্নীর কাহিনী শেষ করে পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা এক বধূর মৃত্যুবিবরণ ভেঙ্কট যখন শুরু করেছে তখনই অরিন্দমের কানে তালা লেগে গেল। মনে পড়ল কৌশিকীকে। ভেঙ্কট কি কৌশিকীর ঘটনা বলছে? তাড়াতাড়ি কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল অরিন্দম। গা গুলোচ্ছিল।

দুই সঙ্গীকে সহ্য করতে পারছে না। পরিচয় ভাঁড়িয়ে দুজন তার গাড়িতে উঠেছে। বোকা বানিয়েছে তাকে। ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যুর পরে, পনেরদিন না যেতে, দেহের ত্তাগিদে তারা ছটফট করতে শুরু করেছে। দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়ির অন্ধকার ঘরে কেন দুজন ঢুকেছিল, অরিন্দমের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। অন্ধকার রাস্তাতে ইচ্ছে করে পেছিয়ে পড়ছে। এসব মানুষ শুকরের বেহদ্দ। সঙ্গিনী নিয়ে শোওয়ার জায়গা না পেলে শ্মশানের চিতায় শুয়ে পড়তে পারে। অরিন্দমের মনে বিরক্তির সঙ্গে অন্য এক ইচ্ছে মাথাচাড়া দিতে থাকল। ভেঙ্কটকে জব্দ করা দরকার। সে-ই ঠকিয়েছে তাকে। মুরলির স্বামী, ছেলে মারা গেছে জেনেও কিলারির চকে তাকে টেনে এনেছে। মুরলিকে ভোগদখল করতে তাকে ব্যবহার করেছে। মুরলিও বিশ্বাস করে না ভেঙ্কটকে। তাকে ধোঁকাবাজ বলেছে। ভুল বলেনি। বোকা বনে গিয়ে অরিন্দমের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। মুরলিকে নিয়ে ভেঙ্কট পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, মুরলির পায়ের চটি খুলে কাদায় ডুবে গিয়েছিল।

জমাট কুয়াশার মত মুরলি দাঁড়িয়ে আছে। ভেঙ্কটকে জব্দ করার ছক অরিন্দম ভেবে নিয়েছে। মুরলিকে অরিন্দম বলল, আমার হাত ধরো।

ডান হাত মুরলির দিকে এগিয়ে দিল। অন্ধকারে হাতটা চেনাতে স্পর্শ করল মুরলির কব্জি। আড়ষ্ট হয়ে গেছে মুরলি। ভেঙ্কট চুপ। মুরলির হাত ধরল অরিন্দম। অন্ধকার ফুঁড়ে তখনই সামনে এসে দাঁড়াল একজন মানুষ। ভয়ে অরিন্দম কেঁপে উঠল। মুরলির হাত ছেড়ে দিল সে। লোকটা ছোরা, ছুরি, পিস্তল এনেছে কিনা দেখা যাচ্ছে না। তার সঙ্গীরা আশপাশে থাকলেও সাড়াশব্দ নেই। ভেঙ্কট পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। অচেনা লোকটা হিসহিস করে বলল, চুপ! কথা বল না। আমার বৌ, ছেলেমেয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে তাদের কেউ আমাকে ডাকলে শুনতে পাব না।

লোকটার গলা ক্রমশ খাদে নেমে গিয়ে বাতাসের ধ্বনির মত শোনাচ্ছে। বিড়বিড় করে সে কথা বলে যাচ্ছে। অরিন্দমের সামনে

থেকে সরে গিয়ে মুরলির মুখের কাছে মুখ নিয়ে স্থির চোখে তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল ভেঙ্কটের সামনে। মানুষটাকে অরিন্দম চিনতে পারল। বিকেলে কিলারিতে দেখা সেই পাগল। পরিবারের সকলকে হারিয়ে পাগল হয়ে গেছে। দাড়িগোঁফ ভর্তি তার মুখ অরিন্দম দেখতে পাচ্ছে। জট পাকানো চুল, কাঁথার মত কিছু শরীরে জড়ানো। ভেঙ্কটের চিবুক ধরে লোকটা আবার বলল, চুপ!

কয়েক পা সরে গেল ভেঙ্কট। ভয়ে অরিন্দমের হাত চেপে ধরেছে মুরলি। বেখেয়াল হয়ে গেছে সে। ঠাণ্ডা মাথায় যে হাতটা ধরতে অরিন্দম সাতপাঁচ ভেবেছে, বিপদের মুহূর্তে অনায়াসে সেই হাত মুরলি ধরে ফেলেছে। সামান্য দ্বিধা করেনি। মুরলির হাতের পাতা এখন বরফের মতো ঠাণ্ডা নয়। বেশ গরম। অচেনা মানুষ দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলেও হাতের পাতায় উষ্ণতা ফিরে পেয়েছে। অরিন্দমের পাঁচটা আঙুল নিজের পাঁচটা আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। ভেঙ্কটের দিকে তাকাচ্ছে না। তাকে যেন ভুলে গেছে। অরিন্দম অনুভব করল, মুরলির হাতের পাতা নরম, আঙুল লম্বা, হাতটা অনেকক্ষণ ধরে থাকা যায়। ধীর পায়ে মানুষটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে মুরলি হাত ছেড়ে দিল। যতো সহজে ধরেছিল, সেরকম অবলীলায় হাত সরিয়ে নিল। অরিন্দমের হাতটা ধরেছিল, এ বোধও যেন তার নেই। অন্ধকারে গাছ, লতা, কাঠ, পাথর ধরার মতো করে হয়তো হাত ধরেছিল।

অরিন্দমের মনের গভীরে অচেনা সন্দেহ খোঁচা দিল। হিসেবে কোথাও ভুল হচ্ছে। মুরলির দিকে তাকালো সে। এক হাত দূরে মুরলি। কুয়াশার মতো অস্পষ্ট তার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। অরিন্দম ভয় পেল। তার শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। না, সে ভুল করছে। তার ভাবনা আগাগোড়া ভুল। শরীর ঘেমে গেছে। ভেঙ্কটকে জব্দ করার ফন্দিটা মাথায় নেই। মুরলির হাত দ্বিতীয়বার সে ধরবে না। পাগলটা এসে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ক্ষেপা লোকটা না এলে জটিল খেলায় সে জড়িয়ে যেত। ভেঙ্কটকে কিলারিতে রেখে গাড়িতে মুরলিকে তুলে লাতুরে চলে যেত। মুরলি একা উঠতে চাইলে তবেই তাকে তুলত। তার সঙ্গে

কেশবের খোঁজে লাতুরে একা যেতে মুরলি আপত্তি করত না। ভেঙ্কট পড়ে থাকত কিলারিতে। তা ঘটেনি। ভাল হয়েছে। খেলার ছলে মুরলিকে লাতুরে নিয়ে গেলে ঘটনা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, বলা মুশকিল। মানুষের সম্পর্ককে যে কোনও ঘটনা বদলে দেয়। ভূমিকম্পের প্রতিবেদন লিখতে এসে মুহূর্তের জন্যে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিল। মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে উঠেছে পোশাক। পাগল মানুষটা যে পথে গেছে, সেদিকে অরিন্দম গেল না। উত্তর-পশ্চিমমুখো রাস্তায় নিঃশব্দে পা বাড়াল। পাগল লোকটাকে লুটেরা ভেবে বুকের ভেতরটা সেই যে ধক করে উঠেছিল, সে কাঁপন এখনও কাটেনি। চার কিলোমিটার দূরত্বের খুব বেশি এক কিলোমিটার এসেছে। আরও তিন কিলোমিটার যেতে হবে। পাশাপাশি হাঁটছে তিনজন। মুরলি রয়েছে মাঝখানে। অরিন্দম, ভেঙ্কটের সঙ্গে সমান তালে হাঁটছে। কোউটির পরে দুটো গ্রাম পেরিয়ে কিলারি পেঁছিতে হবে। গ্রাম দুটোর নাম জানতে ইচ্ছে করলেও মুরলিকে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল না। ভেঙ্কট চুপ হয়ে গেছে। মৃত্যুকাহিনী সে আর শোনাচ্ছে না। দু'দফায় দু'জনের হাত ধরাধরি দেখে হয়ত ঘাবড়ে গেছে। অচেনা ভয় জেগেছে মনে। দু'পাশে দুজন পুরুষের সঙ্গে সাবলীলভাবে মুরলি হাঁটছে। তেমাথা পার হয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকল তিনজন। রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা বাড়ি। বেশিরভাগ বাড়ি ভেঙে পড়েছে। দূরের একটা বাড়িতে মুহূর্তের জন্যে আলো দেখতে পেল অরিন্দম। প্রথমে মনে হল, ভুল দেখেছে। জনমানবহীন অন্ধকার গ্রামে এই রাতে কে আলো জ্বালবে? তখনই আলোটা আবার দেখতে পেল। মোমের আলো নয়। স্থির আলো। হ্যারিকেনের আলোর চেয়ে জোরালো। অন্ধকার ঘরে টর্চ জ্বেলেছিল কেউ। গ্রামে মানুষ আছে। তারা গ্রামবাসী নয়। বাইরে থেকে গ্রামে এসে ঢুকেছে। অন্ধকারে আলো না জ্বেলে, তারা টর্চ ব্যবহার করছে। ফিসফিস করে ভেঙ্কট বলল, বাবুজি, ভুল বুঝবেন না আমাকে।

জায়গা বদল করে ভেঙ্কট পাশে এসে গেছে; তার মুখ অরিন্দম দেখতে পেল না। চাপা গলার কথা শুনতে পেল, কোনও মতলব নিয়ে মুরলির সঙ্গী হইনি। ত্রিশ হাজার মানুষের সঙ্গে আমার সব

মতলব মাটি চাপা পড়ে গেছে। কারও কাছে আমার কিছু চাওয়ার নেই। মুরলি ডেকেছিল সঙ্গী হতে। এড়াতে পারিনি। তার সংসারে ক্ষতি যা ঘটে গেছে, সে জানে না। সে যা বলছে, শুনছি। তার সব হুকুম মেনে নিচ্ছি। তাকে আর দুঃখ দিতে চাই না! কিন্তু আমি আর পারছি না। মনে হচ্ছে, হার্টফেল করে মারা যাব। ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে হয়ত বেঁচে যেতাম। সে উপায় নেই। চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত থেমে অরিন্দমের কানের কাছে মুখ এনে ভেঙ্কট বলল, বাবুজি, আপনি আমাকে একটু কৃপা করবেন?

অরিন্দম জবাব না দিয়ে তাকাল ভেঙ্কটের দিকে। ভেঙ্কট বলল, লাতুরে যেতে চাইছে মুরলি। ও যাক, আমি যাব না। কেশবের খোঁজ করে কিলারিতে সে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তাকে কি লাতুরে আপনি নামিয়ে দিতে পারেন?

বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠলেও অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, লাতুর থেকে মুরলি ফিরবে কী করে?

ঠিক ফিরে আসবে।

কিলারি পেঁৗছে ভাবা যাবে।

ভেঙ্কট, অরিন্দমের আলোচনা মুরলি গ্রাহ্য করছে না। সঙ্গীদের কথা হয়ত তার কানে ঢুকছে না। চারপাশে কেশবকে দেখছে। চোখে না দেখলেও অনুভব করছে উপস্থিতি। কেশবের গলা অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে। তার শরীরের গন্ধ পাচ্ছে। তাকে না নিয়ে মুরলি বাড়ি ফিরবে না। কেশবকে খুঁজতে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। অকুতোভয়ে সে হেঁটে চলেছে। টানটান শরীরে ক্লান্তির ছাপ পড়েনি। তারণা নদীপ্রকল্পের পাথর ভাঙার গুমগুম আওয়াজ অরিন্দম আবার শুনতে পেল। শব্দটা বিকেলে প্রথম শুনেছিল কিলারিতে। কিলারি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙে তারণা নদীতে বাঁধ তৈরীর খবরটা দিয়েছিল ভেঙ্কট। বলেছিল, তিন মাস ধরে কাজ চলছে। সকাল, সন্ধে, এমনকি মাঝরাতে, পাহাড় ভাঙার গুমগুম শব্দ দু'তিনটে তালুক জুড়ে শোনা যায়। আওয়াজটা এখানকার মানুষের গা-সহা হয়ে গেছে। শুনেও শোনে না। ভূমিকম্পের আগেরদিন

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাটির তলা থেকে এই আওয়াজ উঠে আসছিল। তারণা প্রকল্পে পাহাড় ভাঙার আওয়াজ ভেবে কেউ কান দেয়নি। ভূমিকম্পের আগে মাটির নিচে ভাঙচুর হয়, জেনেও বয়স্করা মুখ খোলেনি। তারাও ভেবেছিল আওয়াজ আসছে তারণা প্রকল্প থেকে। আমিও আওয়াজটা শুনেছিলাম। সন্দেহ হয়েছিল মনে। পরে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে রেখেই বা কী করতাম! ত্রিশ হাজার মানুষকে বাঁচাতে পারতাম না। হয়ত সরসীকে বাঁচাতে পারতাম। কচি মেয়েটা রক্ষে পেত। তলানিতে, শ্বশুরবাড়িতে যারা ছিল, এমনকি মুরলির স্বামী সদাশিব দেশপাণ্ডের জীবনও বাঁচানো যেত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মাটির নিচ থেকে উঠে আসা গর্জন, আমি চিনতে পারিনি। পারলে, সবাইকে না হলেও আত্মীয়-স্বজনকে বাঁচাতে চেষ্টা করতাম। বাঁচাতে না পারলে তাদের সঙ্গে মরতে অসুবিধে হত না। সে সুযোগ পেলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বেঁচেও নেই। আমি না জীবিত, না মৃত। আমি কী, নিজেই জানি না। শ্মশানের ছাই ঘেঁটে চেনা মানুষগুলোকে খুঁজে বার করতে চাইছি। তারা মরে গেছে জেনেও মেনে নিতে পারছি না। মাঝে মাঝে ভাবছি, সরসী বেঁচে আছে, আমাদের ছোট্ট মেয়েটা বেঁচে আছে, তলানিতে বিলাস মুক্তমেচারের পরিবারে কেউ মরেনি। ভূমিকম্পটা আদৌ হয়েছে কিনা, সন্দেহ হচ্ছে। মুরলির মত বিশ্বাস করে ফেলছি, কেশব বেঁচে আছে। সোলাপুর থেকে সদাশিব দেশপাণ্ডে যে কোনওদিন বাড়ি ফিরে আসবে। কেশবকে বাড়িতে না দেখলে চটে আগুন হবে। মুরলির কাছে কৈফিয়ত চাইবে। অশান্তি হবে সংসারে। তার আগে কেশবকে বাড়িতে নিয়ে আসা দরকার।

এক মুহূর্ত থেমে ভেঙ্কট বলল, মুরলির টানে নয়, তার বিশ্বাসের টানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। সে পাশে থাকলে মনে হয় ত্রিশ হাজার মানুষ মরেনি। হাজার হাজার ঘরবাড়ি, মাটিতে মিশে যায়নি। কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। সবাই ভাল আছে। এরকম তো হতেই পারে?

প্রশ্নটা করে ভেঙ্কট থামল। নিজের মনে আবার বলল, হতে পারে, কেউ মরেনি। সবাই বেঁচে আছে। সরসী বেঁচে আছে, আমাদের

মেয়েটা, কেশব, সদাশিব বেঁচে আছে। আমি যা জানি, ঠিক নয়।

নিচু রাস্তায় জল জমেছে। তিন জোড়া পায়ের ছপছপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। গ্রামের যে বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল, সেদিকে তাকাল অরিন্দম। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আলো জ্বালাল কে? পাগলটা গেল কোথায়? মৃত্যুর প্রসঙ্গ ছেড়ে ভেঙ্কট যে বিষয় পেড়েছে, তা স্বস্তিকর নয়। কথার খেই হারিয়ে ফেলছে সে। এলোমেলো বকছে। দু'হপ্তা ধরে আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর খবর চেপে রেখে অলীক সত্যের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে। গুলিয়ে ফেলছে বাস্তব, অবাস্তব।

দুপুরে ওমরগা থেকে মুরলিকে নিয়ে গাড়িতে ওঠার সময়ে ভেঙ্কট স্বাভাবিক ছিল। তার কথা, আচরণে বেতাল কিছু অরিন্দম নজর করেনি। নিজের সম্পর্কে ভেঙ্কট যা বলেছিল, সে বিশ্বাস করেছিল। সহোদর ভাই-বোন হিসেবে ভেঙ্কট, মুরলিকে মেনে নিতে অসুবিধে হয়নি। তখনও সে জানত না, ভূমিকম্পে বৌ. মেয়েকে ভেঙ্কট হারিয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামগুলো নিজের চোখে দেখেছে, এবং ক্ষয়ক্ষতির বহর দেখে বেদম জ্বরে ভুগছে। মুরলিকে পাশে পেয়ে শোক সামলে চাঙ্গা হয়ে উঠলেও বিভ্রমের ধোঁয়ায় ভরে গেছে ভেঙ্কটের মগজ। চেষ্টা করেও বিভ্রম কাটাতে পারছে না। গভীরতর বিভ্রমে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মুরলি। না জেনে মুরলি যা করছে, ভেঙ্কট জেনেশুনে তাই করছে। কেশব জীবিত ধরে নিয়ে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে মুরলি। কেশব, মৃত জেনেও তার খোঁজে মুরলির সঙ্গী হয়েছে ভেঙ্কট। মুরলির সঙ্গে তার অলীক প্রত্যাশায়, ভেঙ্কট স্বেচ্ছায় জড়িয়ে গেছে। আসল ঘটনা জেনে যে কোনওদিন মুরলি শোকে ভেঙে পড়বে। তারপর শোক কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে সময় লাগবে না। ভেঙ্কটের বরাতে কী ঘটবে, অরিন্দম ভেবে পেল না। ইলশেগুঁড়ির মত বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। বিদ্যুতের আলোয় সামনে কিছু দেখে ভেঙ্কট ছুটে গেল। কয়েক পা দৌড়ে কাছাকাছি থামল। অন্ধকারে তাকে দেখতে না পেলেও এগিয়ে গেল অরিন্দম। পাশে মুরলি। কিছুটা এগোতে রাস্তার বাঁদিক থেকে ভেঙ্কট ডাকল, বাবুজি? অরিন্দম দাঁড়াল। অন্ধকারে ছায়ামূর্তি'র মত ভেঙ্কট দাঁড়িয়ে আছে। অরিন্দম এগিয়ে যেতে ভেঙ্কট জিজ্ঞেস করল, দেশলাই আছে?

সিগারেট প্যাকেট, আধখালি দেশলাই বাক্সটা অরিন্দমের প্যান্টের পকেটে ছিল। বাক্সে বেশি কাঠি নেই জেনে, এই অন্ধকারেও সেটা খরচ করেনি। ভেংকটের পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, দেশলাই বাক্স দরকার পড়ল কেন?

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। একটা কুয়োর সামনে ভেংকট দাঁড়িয়ে আছে। বলল, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। কুয়োয় যদি একটু জল পাওয়া যায়।

অরিন্দমেরও জল তেষ্টা পেয়েছে। খিদেতে চুঁইচুঁই করছে পেট। দেশলাই কাঠি জেবলে কুয়োর মুখে ধরল সে। কুয়োর পাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভেংকট। ভেংকটের সঙ্গে অরিন্দমও দেখল কুয়ো শুকিয়ে গেছে। দেশলাই কাঠি প্রায় সবটা পুড়ে এসেছে। দু'আঙুলে তাপ লাগলেও জ্বলন্ত কাঠিটা অরিন্দম ধরে আছে। ভেংকট বলল, ভূমিকম্পে সব কুয়ো শুকিয়ে গেছে।

নিভন্ত কাঠিটা কুয়োর মধ্যে অরিন্দম ফেলে দিল। কুয়ো শুকিয়ে গেলেও গাঁয়ে কোথাও জল আছে। খাবারও পাওয়া যায়। খিদে তেষ্টা মেটানোর ব্যবস্থা না থাকলে পাগলটা বেঁচে আছে কি করে? মণ্ডামিঠাই না থাকুক, খেতে জোয়ার পেকে উঠেছে। আখের চাষ কম হয়নি। ভূমিকম্পে সব ওলটপালট হয়ে গেলেও বাঁচার মত রসদ গাঁয়ের মানুষের হাতের কাছে আছে। কুয়োর ধারে ভেংকট দাঁড়িয়ে পড়েছে। অরিন্দম দাঁড়াল না। রাস্তা ঠাহর করে হেঁটে চলল। তাড়াতাড়ি হাঁটলেও রাত সাড়ে আটটার আগে কিলারি পৌঁছানো যাবে না। তার দেরি দেখে মজিদ হয়ত পুলিসচৌকিতে খবর দেবে। কলকাতার সাংবাদিককে খুঁজতে জিপ নিয়ে টহলে বেরিয়ে পড়তে পারে পুলিস। সেরকম ঘটলে মন্দ হয় না। অন্ধকার, অচেনা তিন-চার কিলোমিটার রাস্তা হাঁটা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে মজিদ এখনই সেরকম কিছু করবে না। সবে রাত সাড়ে সাতটা। রাত দশটা পর্যন্ত সে নিশ্চয় অপেক্ষা করবে। তারপর পুলিসকে বলতে পারে। পুলিসও জানে, বিকেলে, কিলারি চক পর্যন্ত যাওয়ার কথা বলে, যারা গ্রামে ঢুকেছিল, তারা ফেরেনি। গ্রাম থেকে না বেরিয়ে তারা কোথায় গেল, এ প্রশ্ন পুলিসচৌকিতে উঠতে পারে। অন্ধকার রাস্তায় সাহস পাওয়ার মত সবরকম চিন্তা অরিন্দম করে।

চলেছে। তার পাশাপাশি, প্রায় গা ঘেঁষে হাঁটছে মুরলি। ভেংকট পেছিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে ভাঙাচোরা বাড়িগুলো ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি রয়েছে, পথঘাট, কুয়ো রয়েছে, অথচ মানুষ নেই। অরিন্দমের মনে হল, লোকালয়ের রাস্তার চেয়ে মেঠো পথে কিলারি ফেরা ভাল ছিল। সে রাস্তায় এমন ভয় পাওয়ানো নির্জনতা ছিল না।

কৌশিকীর জন্যে আবার ব্যাকুলতা বোধ করল অরিন্দম। দোদুলের কথা ভেবে বুকটা কুঁকড়ে গেল। মাথায় ভেসে উঠতে থাকল মৃত্যুর নানা দৃশ্য। ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু বিছানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই প্রশ্নটা শুনতে পেল, জীবনে কত মৃত্যু দেখেছ অরিন্দম? না, মৃত্যুর স্মৃতি সে এখন হাতড়াবে না। স্মৃতিচারণ করার সময় তার নেই। পেশাদার সাংবাদিকের মত কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরতে হবে। সেভাবে শুরু করেছিল। ভূমিকম্প, ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যুর ঘটনাকে সংবাদপত্রে ব্যবহারের কাঁচামাল হিসেবে নিয়েছিল। দু'জন অচেনা মানুষ গাড়িতে উঠে তার হিসেব-নিকেশ বদলে দিয়েছে। তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ভূমিকম্প-পীড়িতদের ভিড়ে। মজিদের বারণ না শুনে গাড়িতে ভেংকট, মুরলিকে তোলা যে ভুল হয়েছে, এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

বাড়ির জন্যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে। দুর্যোগকবলিত মানচিত্রে মিশে যাচ্ছে নিজের সংসার। ঝাঁক বেঁধে আসছে মৃত্যু-স্মৃতি। যে প্রশ্ন নিঃশব্দে কুরে কুরে খাচ্ছে, তা হল কৌশিকীর পেটের শিশুটা ঠিকঠাক ভূমিষ্ঠ হবে তো? মা আর সন্তান বাঁচবে তো? নবজাত শিশু আর সদ্যপ্রসূতা মায়ের মৃত্যুহার দেশে তো কম নয়। অশুভ ভাবনার সঙ্গে মনে পড়ে গেল একটা মৃত্যুর ঘটনা। ভবানীপুরে কানুমামার বাড়িতে সে রাতে ছিল অরিন্দম। কানুমামা ছিল মায়ের খুড়তুতো ভাই। স্কুলে ছুটি পড়লে নিঃসন্তান মামা-মামীর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকত অরিন্দম। কলেজে পড়ার সময়েও যেত। এক সকালে মামীর বুকফাটা কান্নাতে ঘুম থেকে ধড়ফড় করে জেগে উঠল। মামা-মামী থাকত পাশের ঘরে। ঘরে ঢুকে দেখল পাশবালিশ জড়িয়ে কানুমামা ঘুমোচ্ছে। টকটকে ফর্সা, নাদুসনুদুস শরীর। খালি গা, কোমরে চেককাটা লুঙ্গি। ঘুমের

মধ্যে কানুমামা মারা গেছে, অরিন্দম বিশ্বাস করতে পারছিল না। জলজ্যান্ত মানুষটা, পাশে শুয়ে কখন মারা গেল, মামী বুঝতে পারেনি। প্রশান্তি ছড়িয়ে ছিল মৃত কানুমামার মুখে। কানুমামার বয়স তখনও পঞ্চাশ হয়নি। মামী, চল্লিশের কাছাকাছি। এই সুখাবিষ্ট মৃত্যু দেখেও অরিন্দম ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম এলে চমকে জেগে যেত। মনে হত ঘুমের ছদ্মবেশ পরে মৃত্যু বসে আছে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে সে ঘুম আর ভাঙবে না। মহাঘুমের আতঙ্কে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল অনেক রাত। বয়স কম ছিল তখন। মৃত্যুভয় কেটে যেতে সময় লাগেনি। সেই সকালের স্মৃতি থেকে গেছে। মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকলে স্মৃতিগুলো ভিড় করতে থাকে। প্রিয়জনের জন্যে দুর্ভাবনা হয়।

সামনে তাকিয়ে অরিন্দমের মনে হল, রাস্তা ভুল করেছে। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর মাঠ। দিগন্ত পর্যন্ত অন্ধকারের মাঝখানে একটা আগুনের শিখা জ্বলছে। আগুনের শিখা থেকে বোঝা যাচ্ছে মাঠের বিশালতা। আগুন, ঠিক কতদূরে জ্বলছে অনুমান করতে চাইল অরিন্দম। শিখাটা কাঁপছে। বাড়ছে, কমছে। আগুনের দূরত্ব এক-দেড় মাইলের কম নয়। আগুন যারা জ্বেলেছে তারা নিশ্চয়ই কাছে আছে। কাছাকাছি লোকালয়ও আছে। অচেনা রাস্তায় না হেঁটে আগুন লক্ষ্য করে এগনো ভাল। কথাটা ভেঙ্কটকে বলতে কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ওটা চিতার আগুন। লাশ পুড়ছে ওখানে। কোনও গ্রাম নেই ওপাশে।

আগুনের শিখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল অরিন্দম। কিলারির রাস্তা খুঁজে বের করতে আবার সেই তেমাথায় ফিরে যেতে হবে। কম করে দশ মিনিটের হাঁটা পথ। অরিন্দম অনুভব করল, পা দুটো এত ভারি হয়ে উঠেছে, মাটি থেকে তুলতে কষ্ট হচ্ছে। শরীর চলছে না। মুরলি বলল, রাস্তা ভুল হচ্ছে বুঝতে পেরেছিলাম।

মুরলিকে কথা বলতে শুনে অরিন্দম এত খুশি হল যে, ভুল রাস্তায় আসার ক্লান্তি, অনেকটা কেটে গেল। ঠিক রাস্তাটা মুরলি না বলার জন্যে তাকে কোনও প্রশ্ন করল না। বলল, তুমি সামনে থাক। রাস্তা দেখাও।

মুরলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে নড়ল না। ভেঙ্কট

এগিয়ে গেছে। অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না। ভিজে রাস্তায় তার পায়ের শব্দ শুনতে পেল অরিন্দম। মুরলিকে কিছু না বলে সে হাঁটতে শুরু করল। বৃষ্টি থেমে যেতে চারপাশ গুমোট হয়ে উঠেছে। ভারি লাগছে বাতাস। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভূমিকম্পের চব্বিশ ঘণ্টা আগে বাতাসে অক্সিজেন কমে গিয়েছিল। এখনও স্বাভাবিক হয়নি বাতাস। রোজ সন্ধেতে বৃষ্টির পরে বাতাসে অক্সিজেন কমে যায়। সংবাদপত্রে খবরটা পড়েছিল অরিন্দম। নাগেশ্বরও কাল কথাটা বলেছিল। লম্বা শ্বাস টানল অরিন্দম। যথেষ্ট বাতাস বুকের ভেতরে ঢুকল না। একবার রাস্তা ভুল করে অরিন্দম দমে গেছে। ঠিক রাস্তায় হাঁটছে কিনা, প্রতিপদে বুঝে নিতে চাইছে। ভেঙ্কটের পাশে চলে গেছে মুরলি। চাপা গলায় দুজনে কথা বলছে। তেমাথা ছুঁয়ে গ্রামের বাইরে এসে গেছে তিনজন। অন্ধকার রাস্তার দুপাশে ফাঁকা মাঠ। ডানদিকে পাহাড়, টিলা, এলোমেলো কিছু গাছ। বাঁ পাশে হালকা জঙ্গল আর ফসলের খেত। আলাদা করে সূর্যমুখী, আখ, জোয়ারের খেত চেনা যায় না। অরিন্দমের মনে হল ঠিক পথে হাঁটছে। দু'কিলোমিটার পেছনে ফেলে এসেছে কোউটি। কিলারি পৌঁছতে আরও কত পথ হাঁটতে হবে জানে না। পুলিসচৌকির জিপগাড়িটা হেডলাইট জেলে এখন যদি এসে যায়! কথাটা ভেবে অরিন্দম লম্বা শ্বাস ফেলল। শ্বাসটা স্বস্তির, না হতাশার, বুঝতে না পারলেও আরাম অনুভব করল। রাতে, জিপগাড়িটা একবার টহলে বেরবে, এরকম এক ক্ষীণ বিশ্বাস মনের মধ্যে কাজ করছে। টহলের গাড়ি আসার আগে হয়ত তারা কিলারি পৌঁছে যাবে। পথ ভুল না করলে এক ঘণ্টার মধ্যে পুলিসচৌকির সামনে পৌঁছে যাওয়া উচিত। তবু সন্দেহ কাটছে না। কিছু অঘটনের আশঙ্কা মাথায় ঢুকে আছে এবং তা অকারণ নয়, প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছে। ভেঙ্কট, মুরলির টুকরো কথা অরিন্দম শুনতে পেল। ভেঙ্কট বলল, কেশব বেঁচে আছে। দেবদত্ত পিল্লাই-এর বাড়ির সবাই বেঁচে আছে। লাতুরে তাদের দেখা পাব। সদাশিবের সঙ্গেও সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারে।

মুরলি কি বলল, অরিন্দমের কানে গেল না। সোলাপুর থেকে সদাশিব হঠাৎ কেন লাতুরে আসবে, এরকম কোনও প্রশ্ন তুলেছে

মুরলি। তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভেংকট বলল, তলানি থেকে যোগিতাকে নিয়ে লাতুরে পৌঁছে গেছে সদাশিব। সন্তানসম্ভবা যোগিতা হয়ত এর মধ্যে বাচ্চা খালাস করেছে।

ভেংকটের এলোমেলো কথা মুরলি বুঝতে না পারলেও চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। কথাগুলো হয়ত তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। কেশব বেঁচে থাকলে, বাকি ঘটনাগুলো অসম্ভব হবে কেন? সবই সম্ভব। কিলারি চকে ধমক খাওয়ার পর থেকে ভেংকট ধাতস্থ হয়েছে। তাকে আর ভুল বোঝাতে চাইছে না। গরগর করে যা সত্যি, তাই বলছে। মুরলি ক্রমশ নরম হচ্ছে। ফিসফিস করে ভেংকটকে বলল, ওমরগা ফিরে একবার তলানিতে যেও। সরসীর খবর তো একবার নেওয়া উচিত। এতদিনে হয়ত তুমি বাবা হয়ে গেছ।

ভেংকট কী বলল, অরিন্দম বুঝতে পারল না। ঘনিষ্ঠ হয়ে দু'জন হাঁটছে। মুরলিকে এক আজব কাহিনী শোনাচ্ছে ভেংকট। যা ঘটেনি, তাই বলছে। ভূমিকম্প হলেও খুব বেশি মানুষ মারা যায়নি। ভূমিকম্পের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে দূরদর্শনে পূর্বাভাস ছিল। ওসমানাবাদ, লাতুরের মানুষকে সতর্ক করে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে বলা হয়েছিল তাদের! নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে সরকার থেকে সাহায্য করা হয়েছিল। ফৌজি গাড়িতে হাজার হাজার মানুষকে তুলে লাতুর আর সোলাপুরের ত্রাণশিবিরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিলারি, পেটসাংভি, তলানির একজন মানুষও ভূমিকম্পে মারা যায়নি। সবাই আছে লাতুরে। পেটসাংভি থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে পার্বতীও সেখানে পৌঁছে গেছে। দূরদর্শনের খবর শুনে লাতুরে চলে এসেছে সদাশিব।

আজগুবি গল্প শুনিয়ে চলেছে ভেংকট। মুগ্ধ হয়ে মুরলি শুনে যাচ্ছে। খুশির অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠস্বরে, কথায়। মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লেও পরমুহূর্তে খুশিতে বলে উঠছে, কী মজা! কতদিন পরে কেশবের সঙ্গে দেখা হবে! ঘরের লোকজনকে দেখতে পাব লাতুরে।

গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। অরিন্দমের পায়ে লেগে একটা নুড়ি পাথর ছিটকে গেল। কালচে লাল আকাশ। রাস্তার ডানদিক ঘেঁষে জঙ্গল শুরু হয়েছে। ভূতের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে বড়

বড় গাছ। বাঁদিকে খেতের বদলে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি টিলা। অরিন্দমের মনে হল, আবার পথ ভুল করেছে। বিকেলে যে পথে কোউটি গিয়েছিল, সেখানে এসে গেছে। গ্রামের সদর রাস্তা এটা নয়। গা ছমছম করে উঠল তার। অনন্ত ভুলভুলাইয়ায় ঢুকে পড়েছে। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মাকড়সার জালের মত ছড়ানো অন্ধকার টানেল। কোনও টানেল দিয়ে কিলারী পেঁছিনো যাবে না। এক টানেল থেকে অন্য টানেলে ঘুরতে হবে!

কৌশিকী, দোদুলকে অরিন্দমের মনে পড়ল। পৃথিবীর আলো দেখার জন্য কৌশিকীর গর্ভে যে শিশু ছটফট করছে, তার জন্য বুকটা হু-হু করে উঠল। ত্রিশ হাজার মৃত মানুষকে এক অজাত শিশু ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছে। অরিন্দমের মাথার মধ্যে আবার ভেসে উঠল ছেলেবেলা থেকে দেখা নানা মৃত্যুদৃশ্য। চেষ্টা করেও সেই দৃশ্যগুলো ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। পঁচিশ বছর আগে মৃত মোহনদাদুর মুখ অন্ধকারে দেখতে পেল। মোহনদাদু বেঁচে থাকলে আজ কত বয়স হত? সত্তর? না, আরও বেশি। অরিন্দর তখন দশ-এগার বছরের বালক। মাঝরাতে, পাশের বাড়িতে বাবার কনেকাকা, মোহনদাদু মারা গিয়েছিল। পরেরদিন সকালে, শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে মোহনদাদুকে এক চমক দেখেছিল অরিন্দম। মৃত মানুষের বয়স জানার আগ্রহ তখন তৈরি হয়নি। মোহনদাদুর বয়স নিয়ে তাই মাথা ঘামায়নি। যে কোনও বয়সী মানুষের মৃত্যুকে অঘটন মনে হত। খাটিয়ায় শোয়ানো প্রাণহীন মোহনদাদুকে মৃত মনে হয়নি। ফ্যাকাসে মুখ। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জন্ডিসে কিছুদিন ভুগে মানুষটা তখন সেরে উঠছিল। কিছুটা কাবু হলেও মজবুত শরীর ভেঙে পড়েনি! আরও পনের-দিন বিছানাবন্দী থাকার ডাক্তারি নির্দেশ বহাল ছিল। তা সত্ত্বেও বাড়ির ভেতরে মোনহদাদু হাঁটছিল, দোতলাবাড়িতে অল্প ওঠানামা করছিল। মৃত্যুর কোনও লক্ষণ ছিল না শরীরে। তবু সেই লোকটা হঠাৎ কেন মারা গেল, বুঝতে অরিন্দমের আরও দু-তিন বছর সময় লেগেছিল। আসলে এগার বছরের বালক ঠারেঠোরে যতটা জেনেছিল, তা বুঝতে পারেনি। পঞ্চান্ন বছরের সহধর্মিণীর সঙ্গে মিলনের তুঙ্গ মুহূর্তে (আগে, পরেও হতে পারে) একষাট্টি বছরের মোহনদাদু

মারা গিয়েছিল। তার মৃত্যুর না-বলা রহস্য পিসতুতো দাদা, জিজো ব্যাখ্যা না করলে, সে জানতে পারত না। জিজো বিশদ করে বলতে, বিষয়টা তার কাছে প্রাঞ্জল হয়েছিল। মোহনদাদুর মৃত্যুর পরে তার সহধর্মিণী, যাকে অরিন্দম কনেঠাকুমা বলে ডাকত, পরিবারের মধ্যে একঘরে হয়ে গিয়েছিল। কানাঘুষোয় রটে গিয়েছিল মোহনদাদুর মৃত্যুর জন্যে কনেঠাকুমা দায়ী। দুর্বল স্বামীকে কনেঠাকুমা'ই খেয়েছে। বাড়ির মেয়েরা আড়ালে তাকে 'রাক্ষসী' বলত। পারত-পক্ষে তার সঙ্গে কেউ কথা বলত না। সংসারে থেকেও কনেঠাকুমা একা হয়ে গিয়েছিল। মোহনদাদু, কনেঠাকুমার একমাত্র সন্তান, নিশাপিসির বিয়ে হয়েছিল দিল্লিতে। বছরে একবারের বেশি মা-বাবার কাছে আসতে পারত না। মোহনদাদু মারা যাওয়ার পরে তার বাপের বাড়ি আসা আরও কমে যায়। আত্মীয়স্বজনের কথা শুনে নিশাপিসিও হয়ত বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিল মাকে। ঘটনা যাই হোক, বিধবা কনেঠাকুমাকে দেখলে মৃত মোহনদাদুর মুখ অরিন্দমের মনে পড়ত। মোহনদাদুর মৃত্যুর মুহূর্তটা ভাবতে গিয়ে যে ছবি দেখতে পেত, নগ্ন নারীশরীর অঙ্কনপটু কোন চিত্রকর, তা আঁকতে সাহস পাবে না। কাউকে তা বলা যায় না। কৌশিকীকে এক রাতে বলেছিল। শুনে অসাড় হয়ে গিয়েছিল কৌশিকী। তারপর রাতে বিছানায় শুয়ে অরিন্দম স্পর্শ করলে কৌশিকী আড়ষ্ট হয়ে থাকত। অবস্থা স্বাভাবিক হতে পাঁচ-সাতদিন লেগেছিল।

মোহনদাদুর মৃত্যুঘটনা দ্বিতীয়বার কৌশিকীকে না শোনালেও মৃত মানুষটার মুখ চেষ্টা করেও অরিন্দম ভুলতে পারেনি। মনে উদ্বেগ জমলে পাঁচটা মৃত্যুদৃশ্যের সঙ্গে মোহনদাদুর মুখ দেখতে পায়। মৃত্যুর সাত-আট ঘণ্টা পরেও মৃত মানুষটার শরীরে ক্লান্তি জড়িয়ে ছিল। নিমপাতা দিয়ে ঢাকা চোখের পাতা, তুলো গোঁজা নাক, মুখের আদল অনেকটা বদলে দিলেও মোহনদাদুর মুখচোখে ছড়ানো অসহায়তা ঢাকতে পারেনি। মানুষটা যেন রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছে। মৃত্যুর পরেরদিন সকালে মোহনদাদুর যে মুখ অরিন্দম দেখেছিল, তিনবছর পরে মৃত্যুর কারণ জানার মুহূর্তে অবিকল সেই মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। সেদিন

বুঝেছিল, মৃত মানুষের মুখ দেখে তার মৃত্যুর কারণ অনুমান করা যায়। কিলারি যাওয়ার পথ, দ্বিতীয়বার হারিয়ে, মোহনদাদুর মুখ মনে পড়ার কারণ টের পেতে অরিন্দমের অসুবিধে হল না। সে অনুভব করল, ত্রিশ হাজার মৃত্যুর চেয়ে বড় মৃত্যু ঘিরে ধরছে তাকে। মৃত্যুগণ্ডির মাঝখানে রয়েছে সন্তানসম্ভবা কৌশিকী আর দোদুল। গণ্ডির সীমানায় সে দাঁড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে বৌ' ছেলেকে ছুঁতে পারছে না। পেছন থেকে চড়া গলায় কেউ বলল, দাঁড়াও।

হুকুম করার ভঙ্গিতে হিন্দিতে কথাটা বলল। বলাতে রুক্ষতা ছিল। ধক করে উঠল অরিন্দমের বুক। পকেটে রাখা দেশলাই-বাক্সটা খামছে ধরল। অস্ত্র বলতে এটা আছে। সে দাঁড়াল। ভেঙ্কট, মুরলি না শোনার ভান করে এগিয়ে চলেছে। ভান যাই করুক, তাদের পায়ের শব্দে বোঝা যাচ্ছে হুকুম শুনে তারা তড়িঘড়ি হাঁটা শুরু করেছে। দ্রুত হয়েছে তাদের পা ফেলা। পেছন থেকে আর একজন বলল, কী হে, কথা কানে যাচ্ছে না ?

অন্ধকারে শিস দিল কেউ। শিসের তীব্র আওয়াজ থামতে একজন বলল, মেয়েছেলেটাকে আগে আমি খামসাবো।

হা হা করে হেসে উঠল একজন।

কয়েক জোড়া পা পেছন থেকে ছুটে আসছে। আকাশের দিকে তাকাল অরিন্দম। কালচে লাল আকাশ, গোলাপি হয়ে উঠছে। স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

সাত

মেরা লাড়া ছোড় দো

(ইলা অরুণের গান)

অরিন্দম দাঁড়িয়ে পড়তে, তাকে ছেড়ে দৌড়ে ভেঙ্কট, মুরলির দিকে চলে গেল দু'তিনজন লোক। অন্ধকারে তাদের মুখ দেখতে না পেলেও তারা যে দশাসই চেহারার মানুষ, অরিন্দমের বুঝতে অসুবিধে হল না। রাস্তার ধারে সরে দাঁড়িয়েছে সে। ভেঙ্কটকে লক্ষ্য করে একজন চেঁচাল, এই বেজন্মার বাচ্চা, কথা কানে যাচ্ছে না।

অন্যজন বলল, প্যান্টুল খুলে নেব।

হরিণের মত যার ত্রস্ত দৌড়ের হালকা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সে নিশ্চয় মুরলি। অচেনা, অন্ধকার রাস্তায় কতদূরে দৌড়ে যাবে সে? কোথায় পালাবে? পেছন থেকে কারা যেন আসছে। মারাঠি ভাষায় ফিসফিস করে তারা কথা বলছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের দেখতে চেষ্টা করল অরিন্দম। অস্পষ্টভাবে দুজন লোককে দেখতে পেল। দু'জনের একজন মোটাসোটা। থপথপ করে সে হাঁটছে। তার পাশে লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারার একজন লোক। দুই ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। মোটার হাতের টর্চের আলো এসে পড়ল অরিন্দমের মুখে। তার দু'চোখ ধেঁধে গেল। সামান্য দূর থেকে মেয়েলি গলা আতঙ্কে ডুকরে উঠল। গলাটা চেনা। মুরলিকে লোকদুটো ধরে ফেলেছে। মুরলির নিস্তেজ গলা দ্বিতীয়বার বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার পরেও ধস্তাধস্তির শব্দটা অরিন্দম শুনতে পাচ্ছে। ভেঙ্কটকে বোধহয় এখনও কাবু করতে পারেনি। টর্চের আলো মুখ থেকে গলায় নামতে চোখ খুলল অরিন্দম। তাকে খুঁটিয়ে দেখে মোটা লোকটা হিন্দিতে তার পরিচয় জানতে চাইল। অরিন্দম জানাল। বলল, ভূমিকম্পের খবর করতে এসেছে। টর্চের পেছনে দাঁড়ানো দু'জনকে স্পষ্ট করে না দেখতে পেলেও তার পরিচয় শুনে মোটা আর সিড়িঙ্গের মুখ চাওয়াচাওয়ি করাটা, তার নজর

এড়াল না। মোটা জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গীরাও কি কলকাতার লোক?

ভেঙ্কট, মুরলির সম্পর্কের গোপন অংশ চেপে গিয়ে তাদের পরিচয় বলল অরিন্দম। মোটা, সিড়িঙ্গে চাপা গলায় কিছু পরামর্শ করল। অরিন্দমকে সিড়িঙ্গে বলল, চল।

কোথায়?

জাহান্নামে।

ত্রিশ হাজার মৃত লোক ঘিরে দাঁড়াল অরিন্দমকে। তার কানের পর্দায় ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, মৃতের সংখ্যা ত্রিশ হাজার এক হলে অসুবিধে কি?

টর্চ নিভে গেছে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বলল, আমার কাছে যা আছে, নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।

সিড়িঙ্গে খলখল করে হেসে জিজ্ঞেস করল, কী আছে তোমার কাছে?

পকেটে হাত ঢোকাল অরিন্দম। সিড়িঙ্গে হাত পাতল। তার হাতের পাতায় মোটা টর্চের আলো ফেলল। চৌকো পাতায় ছ'টা আঙুল। কড়ে আঙুলের পাশ থেকে ষষ্ঠ আঙুলটা গজিয়েছে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে সিড়িঙ্গের হাতে দিল অরিন্দম। সিড়িঙ্গের চোখদুটো চকচক করছে। তার মুখ ভালরকম দেখা যাচ্ছে। লম্বাটে মাথার সামনে বড় টাক, পুরুষ্টু, পাকানো গোঁফ, কুঁতকুঁতে চোখদুটো লাল হয়ে আছে। নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ। তার হাতে ঘড়ি, আংটি দিল অরিন্দম। দু'হাজার টাকা গাড়িতে রেখে এসেছে। মানিব্যাগে বিশেষ টাকা-পয়সা নেই। হাতঘড়ি অনায়াসে দিলেও আংটি হস্তান্তর করতে কষ্ট পেল। ফুলশয্যার রাতে তার আঙুলে আংটিটা কৌশিকী পরিয়ে দিয়েছিল। আট বছরে আঙুল থেকে একবারও আংটি খোলেনি। আজ খুলল, এবং চিরদিনের মত অচেনা হাতে তুলে দিল। হাতঘড়ি, আংটি নিয়ে তার কাঁধে ঝোলান ক্যামেরা ধরে সিড়িঙ্গে টান দিল। হ্যাঁচকা টানে এক পা এগিয়ে গেল অরিন্দম। কাঁধের ক্যামেরা সিড়িঙ্গেকে দিল। ক্যামেরাবন্দী সূর্যমুখীর খেত, গণচিতার আগুন, দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বিধ্বস্ত ভিটে, নিমেষে বেহাত হয়ে গেল। কিল্লারি আসার কোনও প্রমাণ

তার কাছে থাকল না। অরিন্দম শুনল, কোথাও একটা বাচ্চা কাঁদছে। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার কান্নার আওয়াজ। সে এখনও জন্মায়নি। তবু মাতৃগর্ভ থেকে উঠে আসা তার কান্না, চরাচর ঢেকে দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়ার আশায় বুক পকেট থেকে কলমটা নিয়ে সিড়িঙ্গের হাতে তুলে দিল। রুমাল ছাড়া পকেটে কিছু নেই। রুমালটা দেওয়ার কথা অরিন্দমের মাথায় আসার মুহূর্তে সিড়িঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আর কী আছে? রুমাল বার করল অরিন্দম। রুমালটা সে দেওয়ার আগে সিড়িঙ্গে হাত সরিয়ে নিল। টর্চ নিবিয়ে মোটা বলল, চল।

কোথায় যেতে হবে, অরিন্দম জানে। সেখানে যাওয়ার রাস্তাটা জানে না। জাহান্নাম ঠিক কোথায়?

সিড়িঙ্গে বলল, জলদি পা চালাও।

অরিন্দম কিছু বলার আগে দু'পাশ থেকে দুজন, তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। অন্ধকার রাস্তা। লোক দুটোর মুখ থেকে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরচ্ছে। খোঁড়া লোকটা বেতাল পায়ে হাঁটলেও তার মুঠো আলগা হচ্ছে না। লোহার মত শক্ত পাঞ্জার চাপে অরিন্দমের কব্জি টনটন করছে। শিরীষ কাগজের মত খরখরে সিড়িঙ্গের হাতের পাতা। তেমাথা পেরিয়ে ভাঙাচোরা একটা বাড়িতে অরিন্দমকে নিয়ে তারা ঢুকল। ঘুটঘুটে অন্ধকার বাড়ি। সামনে লম্বা দাওয়া। অরিন্দমের হাত ছেড়ে দিয়ে তাকে মাঝখানে রেখে লাইন করে তিনজন হাঁটছে। সুড়ঙ্গের মত অন্ধকার পেরিয়ে তারা একটা ঘরে ঢুকল। মদের গন্ধে ভারি হয়ে আছে ঘরের বাতাস। মোটা টর্চ জ্বালল। অরিন্দমের পেছন থেকে মোটার পাশে এসে দাঁড়াল সিড়িঙ্গে। মোটা বলল পালানোর চেষ্টা কর না। মারা পড়বে। আমরা বাইরেই আছি।

পকেট থেকে হঠাৎ একটা রিভলভার বার করে অরিন্দমের কপালে ঠেকিয়ে সিড়িঙ্গে বলল, একে বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ?

অরিন্দম চোখ বুজল। মুখে বিরক্তির শব্দ করে মারাঠি ভাষায় মোটা যা বলল, অরিন্দম বুঝল না। টের পেল, মৃত্যুদণ্ড আপাতত রদ হয়েছে। কুচকুচে কালো ছ'ইঞ্চি আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখে হিম হয়ে গেছে বুক। পেশাদার খুনিদের পাল্লায় পড়েছে। শুধু লুট করে

ছেড়ে দেওয়ার লোক, এরা নয়। অরিন্দম চোখ খুলল। সিড়িঙ্গের কাঁধে ঝুলছে তার ইয়াসিকা ক্যামেরা। দুবছর আগে, শখ করে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায় ক্যামেরাটা কিনেছিল। খুব বেশি ব্যবহার করেনি। সে চিত্রসাংবাদিক নয়। বৌ, ছেলে নিয়ে বেড়াতে গেলে ক্যামেরা সঙ্গে রাখে। দুবছরে তিনবারের বেশি কলকাতার বাইরে যাওয়া হয়নি। গত বছর দোদুলের জন্মদিনে কিছু ছবি তুলে ছিল। টর্চ নিভল। তাকে ঘরে রেখে মোটা আর সিড়িঙ্গে চলে গেল। বাইরে থেকে দরজায় শেকল তোলার শব্দ হল। অন্ধকার ঘরে অরিন্দম একা। সামনে এগোতে পারছে না। পা বাড়ালে, কোনো চোরা খাদের নিচে তলিয়ে যেতে পারে। ডাইনে, বাঁয়ে কোথায় খাদ আছে, ফাটল আছে, বলা মুশকিল। অন্ধকার সরে যেতে গবাক্ষের মত ছোট জানলা চোখে পড়ল। জানলার বাইরে লালচে আকাশ। আকাশ দেখে ভরসা পেল। তখনই খেয়াল হল পকেটে একটা আধখালি দেশলাই বাক্স, প্যাকেটে কয়েকটা সিগারেট আছে। পকেট থেকে বাক্সটা বার করে একটা কাঠি জ্বালাল। ফিকে আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। সেই আলোতে ঘরের ভেতরটা একনজরে যতটা সম্ভব দেখে নিল। মাটির মেঝে। একপাশে ফাটল ধরলেও মাটির নিচে মেঝে নেমে যায়নি। অগুনতি মদের বোতল মেঝেতে গড়াগাড় খাচ্ছে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে পোড়া বিড়ি, সিগারেট, দেশলাই কাঠি। চৌকোনা ঘুলঘুলির চেয়ে সামান্য বড় জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তায় চোখ রাখতে অরিন্দম ঘরটা চিনতে পারল। অন্ধকার রাস্তা থেকে এই ঘরটাতে মুহূর্তের জন্যে আলো দেখেছিল। রাস্তাটা আরও কয়েক সেকেন্ড নজর করে অরিন্দমের মনে হল, হ্যাঁ, সেই ঘর। রাস্তা থেকে যে আলো চোখে পড়েছিল, তা দেশলাই কাঠির আগুন। বিড়ি বা সিগারেট ধরাচ্ছিল কেউ। টর্চের আলোও হতে পারে। চারচালা ঘরের মাথা থেকে একপাশের টিন ভূমিকম্পে পড়ে গেছে। বাকি টিন ঠিক জায়গায় আছে। প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরাল অরিন্দম। জ্বলন্ত কাঠির আলোয় শেকল টানা কাঠের বন্ধ দরজাটা নজর করার আগে কাঠি নিভে গেল। আরও একটা কাঠি জ্বালাতে গিয়ে জ্বালল না। হিসেব করে কাঠি খরচ করতে হবে। তাছাড়া, আলো জ্বেলে মোটা আর সিড়িঙ্গের দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে চায় না। তাকে ঘরে পুরে দু'জন কোথায় গেল, সে অনুমান করেছিল। সঙ্গীদের কাছে ফেরার জন্য তাদের ব্যস্ততা দেখে তারা যে এখনই মুরলির শরীরে ভাগ বসাতে চায়, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পরিচিত দুজন মানুষের জন্য অরিন্দম উদ্বিগ্ন হল। মানুষ দু'জন খারাপ নয়। সরল, নিরীহ। মন থেকে মায়া, মমতা, এত বিপর্যয়ের পরেও উবে যায়নি। কিলারি আসতে, তার গাড়িতে ওঠার জন্য যেটুকু ছলনা করেছে, তা মনে রাখার মত নয়। সে মিথ্যেতে তার কোনও ক্ষতি হয়নি। গাড়িতে উঠে সারা পথ সংকোচে মাটিতে মিশেছিল দু'জন। তারপরও চোখ তুলে কথা বলেনি। এখন তারা কোথায়, কী অবস্থায় আছে? মুরলির জন্যে দুশ্চিন্তায় কেঁপে উঠল অরিন্দম। তেষ্টায় গলা জ্বালা করছে। আধখাওয়া সিগারেট ফেলে দিল। ভেঙ্কট, মুরলিকে যারা ধরেছে, সংখ্যায় তারা পাঁচের কম নয়। বেশি হতে পারে। চারজনকে দেখেছে। বাকিরা কাছে কোথাও আছে। কোউটি আসার সময় থেকে তারা নজর রাখছে। ছায়ার মত পেছনে লেগে রয়েছে। কোউটিতে দেবদত্ত পিল্লাইয়ের বাড়িতেও চোরাপথে ঢুকে তারা লুকিয়ে ছিল। ভূমিকম্পকবলিত কিলারি তালুক তাদের নখদর্পণে। তারা এখন এখানকার তালুকদার। মুরলিকে তারা ছিঁড়ে খাবে। মুরলি বাঁচবে তো? এতক্ষণে ভেঙ্কট হয়তো খুন হয়ে গেছে। ভেঙ্কটকে মেরে ফেললে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। ত্রিশ হাজারের সঙ্গে এক সাংবাদিকের নাম মৃতের তালিকাভুক্ত হবে।

অন্ধকার ঘরে কিছু চলাফেরা করছে। সিরসির শব্দ হচ্ছে। সাপ নাকি? মাটির মেঝেতে সাপ বুকে হাঁটছে। হতে পারে। সাপ, বিছে, মাটির তলার যত পোকামাকড়, ভূস্তরের ওলটপালটে জায়গা বদলেছে। মাটির ওপরে উঠে এসেছে। অরিন্দমের মনে হল মাটি কাঁপছে। ঘর দুলছে। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? আবার? হতে পারে। ভূমিকম্প তো একরকম নয়। শুধু মাটির নিচে কম্পন হয় না। মাটির তলা, আর ওপর সবসময় কাঁপছে। ভূস্তরের মত মাটির ওপরে বায়ুস্তর লণ্ডভণ্ড হচ্ছে। প্রকৃতির পাগলামি থামলেও মানুষের তাণ্ডব কখনও থামে না। কাঁপুনিও থামে না।

সবাই টের পায় না সে কাঁপুনি। যে পায়, তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়। জানলার কাছ থেকে সরে গিয়ে সন্তর্পণে দ্বিতীয় দেশলাই কাঠি জ্বালল অরিন্দম। কাঠির আলো দেখার মত কেউ কাছাকাছি না থাকলেও সাবধান হওয়া ভাল। যারা দেখত, মুরলিকে ভাগজোক করে নিতে এই মুহূর্তে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আরও কিছু সময় ব্যস্ত থাকবে। তার মধ্যে এই ঘর থেকে বেরনো দরকার। কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথায়? অন্ধকার, অচেনা রাস্তায় ঘুরপাক খেয়ে আবার লুটেরাদের খপ্পরে পড়তে হতে পারে। তারপর? অরিন্দম আর ভাবতে পারছে না। কাঠি নিভে গেল। ভূমিকম্প থামেনি। পৃথিবী দুলছে। দোদুল এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। না-ও ঘুমোতে পারে। মায়ের মুখে বাবার টেলিফোন আসবে শুনে নিশ্চয় জেগে বসে আছে। বাবার সঙ্গে কথা না বলে সে ঘুমোবে না। যতক্ষণ পারে, জেগে থাকবে। সারা রাত চোখের পাতাদুটো এক করতে পারবে না কৌশিকী। মায়ের সঙ্গে কি তার পেটের বাচ্চাও জেগে থাকে? মায়ের গর্ভের নিরঙ্কুশ অন্ধকারে অজাত শিশুর ঘুম, জাগরণে কি কোনও তফাত ঘটে? বোধহয় না। তবে মা না ঘুমোলে গর্ভের শিশু কষ্ট পায়। মায়ের অসুখ করলে তার সংক্রমণ হয়। সে কেঁদে ওঠে। তার কান্নার আওয়াজ পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে যায়। পৃথিবী কাঁপতে থাকে। সেই আওয়াজ অরিন্দম শুনতে পাচ্ছে। অনুভব করছে পৃথিবীর কাঁপন। অনেক বছর আগে পল্টুর মৃত্যুর খবর শুনে যে ভূকম্প টের পেয়েছিল, তা থামেনি। দৌড়ে বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। অস্থির লাগছে শরীর। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল অরিন্দম। মনে মনে বলল, শান্ত হও অরিন্দম। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আকাশের দিকে তাকাও। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নাও। মনে রেখ, বাড়িতে সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মাথার ঘোলাটে ভাব ধীরে ধীরে কেটে গেল। অন্ধকারে ঝিঁঝি ডাকছে। ঝিঁঝির একটানা ডাকের সঙ্গে জলস্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম। আন্দাজে হাতড়ে দরজার ফ্রেমটা দুহাতে ধরে নাড়াতে চেষ্টা করল। অল্প নড়লেও পলকা দরজা নয়। গায়ের জোরে ফ্রেমসমেত দরজা উপড়ে

ফেলা যাবে না। ধাক্কা দিয়ে বন্ধ দরজার পাল্লা খোলা কি সম্ভব? পাল্লার ওপর হাত রেখে চাপ দিল অরিন্দম। গায়ের জোর ফলালে আওয়াজ হতে পারে। শ্মশানের মত নিস্তব্ধ গ্রামে দশগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে আওয়াজ। লোকগুলো শুনে ফেলতে পারে। জানলার কাছে অরিন্দম আবার ফিরে এল। জানলায় লাগানো তিনটে লোহার শিক। প্রথমটা ধরে টানল। শিক নড়ল না। মাঝেরটা একটু টানতে খুলে গেল। অরিন্দম ভাবেনি, এমন হবে। ছোট জানলা। ঘেঁষা-ঘেঁষি শিকের একটা খুলে গেলেও জানালা দিয়ে বাইরে বেরবার মত যথেষ্ট জায়গা হল কিনা, বুঝতে পারল না। শিকের ফাঁকে মাথা গলাতে পারলে, শরীর বেরিয়ে যাবে। কান পর্যন্ত ঢুকে দুটো শিকের মাঝখানে মাথা আটকে গেল। কানদুটো না থাকলে মাথা বেরিয়ে যেত। মাথা বেরলে শরীর বার করতে অসুবিধে হত না। জানলার মাঝখানে শিকটা রেখে অরিন্দম আকাশের দিকে তাকাল। লালচে আকাশ। যে কোনও মুহূর্তে অঝোরধারে বৃষ্টি নামতে পারে। হু-হু করে সময় চলে যাচ্ছে। এক ঘণ্টা হয়ে গেল ঘরের মধ্যে আটকে আছে। আজ রাতে পুলিসের জিপ টহলে বেরবে কিনা সন্দেহ। বেরলেও তাকে খুঁজে পাবে না। এখান থেকে চেঁচিয়ে তাদের নজর কাড়া অসম্ভব। জানলার ফ্রেম দুহাতে ধরে ঝাঁকুনি দিতে হুড়মুড় করে কয়েকটা পাথরের চাঁই খসে পড়ল। জোরালো আওয়াজে চমকে গেল অরিন্দম। ভয় পেল। লুটেরাদের কেউ শুনলে সে খুন হয়ে যাবে। জানলার কাছ থেকে সরে গিয়ে চুপ করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল। পালাবার পথ পেয়ে গেছে। ফ্রেমসুদ্ধ জানালা খুলে নেওয়া শক্ত নয়। তারপর অনায়াসে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যায়। চিন্তা, অন্য জায়গায়। অন্ধকার, অচেনা রাস্তায় কিলারি পৌঁছতে পারবে কিনা, এ নিয়ে মনে সন্দেহ জাগছে। ধরা পড়ে গেলে কোতল হয়ে যাবে। ঘরে বসে থাকলে কি বাঁচবে? কলকাতার এক সাংবাদিককে লোকগুলো কি জীবন্ত ছেড়ে দেবে? নিজের জন্য অরিন্দমের কষ্ট হল। কষ্ট হল, নিজের বোকামির জন্য! সে ডাহা বোকা। দুজন অচেনা মানুষকে গাড়িতে তোলা উচিত হয়নি। তাদের সঙ্গে কিলারি আসার কারণ ছিল না। ঝোঁকের মাথায় ভুল রাস্তায় এসে গেছে।

অতি বড় গবেট ছাড়া এ কাজ করে না। তার মত এক নির্বোধের ওপর নির্ভর করে কৌশিকী, দোদুল বেঁচে আছে, ভেবে তাদের জন্যে করুণা হল। নিজেকে বাঁচানোর মুরোদ যার নেই, বৌ, ছেলেকে সে কীভাবে বাঁচাবে? সামান্য ঝড়ে উল্টে যাবে তার সংসার।

ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে ব্যাঙেরা গলা মেলাল। জানলার কাছে আবার সে এসে দাঁড়ালো। দু-হাতে জানলার ফ্রেমটা শক্ত করে ধরে টান মারলো। পাথর-মাটি খসে পড়ার আওয়াজে চমকে উঠল। জানলার ফ্রেম খুলে ফেলল অরিন্দম। নিস্তব্ধ অন্ধকার। স্থির হয়ে কয়েক সেকেন্ড অরিন্দম দাঁড়িয়ে থাকল। একতলা বাড়ি। জানলার ঠিক নিচে রাস্তা। অন্ধকারে রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। মেঝেতে ফ্রেমটা রেখে অরিন্দম জানালার বাইরে একটা পা বাড়াল। জমি থেকে জানালা অনেকটা উঁচু। মাটিতে পা ঠেকল না। জানলায় বসে দু'পা বাড়িয়ে মাটি পেল না। সাহসে ভর করে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল। জলকাদা ছিটকে ওঠার শব্দ হল। কুকুরের মত একটা জীব ছুটে সরে গেল। শিয়ালটাকে চিনতে পারল অরিন্দম। ভেঙেপড়া বাড়ির চাতালের তলায় কোনও গহ্বরে হয়ত ওর খাবার রাখা আছে। খানিকটা দূরে একদল শিয়াল হঠাৎ ডেকে উঠতে অরিন্দমের গা ছমছম করে উঠল। অন্ধকার রাস্তা ধরে তেমাথার দিকে নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল সে। তেমাথা থেকে কিলারির রাস্তা পেতে আর অসুবিধে হবে না। কিলারি পুলিশচৌকিতে কোনও-ভাবে সে পৌঁছতে চায়। ভেঙ্কট, মুরলির বিপদের খবর সেখানে জানিয়ে সে লাতুর চলে যাবে। মাঝরাতে লাতুরে পৌঁছলেও অসুবিধে নেই। হায়দরাবাদ থেকে হোটেল বুক করে রেখেছে নাগেশ্বর। হোটেলে একটা ঘর তার জন্য রাখা আছে। পায়ের তলায় কিছু নড়ে উঠতে লাফিয়ে সরে গেল অরিন্দম। জিনিসটা শক্ত। কিন্তু জীবন্ত। অন্ধকার রাস্তায় ঝুঁকে কী মাড়াল, দেখার চেষ্টা করল। গোলাকার কিছু ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও দেশলাই কাঠি জ্বালল না। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ছোট সাইজের কচ্ছপটাকে চিনতে পারল। আশপাশের কোনও জলাজমি থেকে উঠে এসেছে। প্রাণীদের মধ্যে সকলের আগে ভূমিকম্পের খবর পায় কচ্ছপ।

মানুষকে সে খবর জানাতে নিজের ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের ঝোপের মধ্যে কচ্ছপটা ঢুকে গেল। ভয়ে গুড়-গুড় করছে অরিন্দমের বুক। পৃথিবীতে এরকম একটা রাত কাটাতে হবে, সে কখনও ভাবেনি। নিরীহ সংসারী লোক সে। বড় কোনও ঝুঁকি কখনও নেয়নি। নিতে চায় না। আত্মীয়-বন্ধুদের ঝুটঝামেলা এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেয়। সংবাদপত্রে চাকরি করলেও প্রথম পাতার খবর লেখার জন্য সহকর্মীদের সঙ্গে তার কোনও প্রতিযোগিতা নেই। সে সম্পাদক হতে চায় না, কোটিপতি হওয়ার অভিলাষও তার নেই। পাঁচজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মত সে সংসার করতে চায়। সুখের চেয়ে বেশি করে স্বস্তি চায়। লোমহর্ষক কিছু করার কথা কখনও ভাবেনি। অ্যাডভেঞ্চারের শখ তার নেই। আশি মাইল স্পিডে গাড়ি চেপে ঘোরার চেয়ে আউট্রাম ঘাটে সপরিবারে নৌকোয় বসে সূর্যাস্ত দেখতে ভালবাসে। নৌকো ঈষৎ দুললে ভয় পেয়ে যায়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার কথা কখনও ভাবেনি। মৃত্যুর ছোট ভাই, রোগশোক, দুর্ঘটনা থেকেও দূরে থাকতে চেয়েছে। ভূমিকম্পে মৃত ত্রিশ হাজার মানুষের খবর করতে এসে নিজে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গেছে। গায়ে এসে লাগছে মৃত্যুর হিমেল বাতাস। টের পাচ্ছে, তার জীবনে এটাই শেষ রাত। রাতটা কাটবে না। তাকে বাদ দিয়ে কাল সকালে সূর্য উঠবে। জিপগাড়ি টহলে বেরলে সে বেঁচে যেতে পারে। তার আগে কিলারির রাস্তা খুঁজে পাওয়া দরকার। রাস্তাটা পেলে শেষবার বাঁচার চেষ্টা করবে। কিলারি পৌঁছলে পুনর্জন্ম ঘটবে। ছ'মাস-একবছর পরে কলকাতার বাড়িতে বসে, এই রাতের কথা ভেবে শরীরে কি শিহরণ জাগবে? বোধহয় না। রাতের দুঃস্বপ্ন মনে হতে পারে। মৃত্যুভয় তরল হয়ে গেলে তা হাসির খোরাক জোগায়। এ কাহিনী শোনার জন্য তখন কাউকে পাওয়া যাবে না। সে নিজেও ভুলে যাবে এই রাতের ঘটনা।

প্রাণ হাতে করে হাঁটছিল অরিন্দম। সামান্য শব্দে কেঁপে উঠছিল। যে কোনও মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারে। অন্ধকারে সেই কুয়োটা দেখতে পেল। কুয়োর জল খেতে চেয়েছিল ভেঙ্কট। কুয়োটার কাছাকাছি এসে ছলাৎ করে উঠল অরিন্দমের বুকের রক্ত। কুয়োর ভেতরে কেউ গোঙাচ্ছে। ছাগল, ভেড়া নাকি?

কান খাড়া হল তার। গোঙানির সঙ্গে কুয়ো থেকে নড়াচড়ার আওয়াজ আসছে। মন দিয়ে আওয়াজটা শুনে মানুষের গোঙানি বুঝতে পারল। কুয়োয় পড়ে হাঁকপাঁক করছে কেউ। অরিন্দমের গায়ে কাঁটা দিল। অন্ধকারে লুকিয়ে পড়তে চাইল সে। পরমুহূর্তে মনে হল, কুয়োয় পড়ল কে? এল কোথা থেকে? দুঘণ্টা হয়নি, দেশলাই কাঠি জ্বেলে কুয়োয় জল আছে কিনা দেখেছিল। কুয়োটা খুব বেশি, পনের ফুট গভীর। কুয়োর তলা পর্যন্ত তখন নজর করেছিল। ভূমিকম্পে কুয়ো শুকিয়ে গেছে। ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টির জলে ভিজে রয়েছে কুয়োর নিচের মাটি। তৃষ্ণার্ত ভেঙ্কট, ভেতরটা দেখে কুয়োতলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। সেই কুয়োতে মানুষ সেঁধল কীভাবে? মানুষ না হয়ে কুকুর, শিয়াল হতে পারে। ভয় পেলেও পায়ে পায়ে কুয়োর পাশে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম। কুয়োর বাঁধানো দেওয়ালে নখের আঁচড় কাটার আওয়াজ শুনল। ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলছে কেউ। ধপাস করে ভারি কিছু পড়ার পরে আবার গোঙানি শুরু হল। শ্বাসের আওয়াজে পশু মনে হলেও মানুষের মত কেউ গোঙাচ্ছে। খুকখুক করে অরিন্দম কাশতে গোঙানি থেমে গেল। নখের আঁচড় টানার আওয়াজ আগে বন্ধ হয়েছে। কুয়োর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অরিন্দম আবার কাশল। সমানে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। কুয়োর ভেতর থেকে চাপা গলায় কেউ ডাকল, মুরলি?

ডাক শুনে চমকে গেল অরিন্দম। ভেঙ্কট কীভাবে কুয়োর মধ্যে পড়ল, ভেবে পেল না। ভেঙ্কট কি ভয় পেয়ে কুয়োতে লাফিয়ে পড়েছিল? হতে পারে। মুরলি কোথায়? কাছে কোথাও থাকতে পারে। কিন্তু তা কী করে হয়? ভেঙ্কট, মুরলিকে যারা ধরেছিল, গায়ে হাত বুলিয়ে ছেড়ে দেওয়ার লোক তারা নয়। কুয়োর মধ্যে ভেঙ্কটকে ঝাঁপ দিতে দেখলে তারা গুলি করে মারত। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর মত সেয়ানা লোক, ভেঙ্কট নয়। কী ঘটেছিল তাহলে? প্রশ্নটা মনে জাগতে অরিন্দম গুটিয়ে গেল। ভেঙ্কট মুরলিকে নিয়ে সে আর মাথা ঘামাতে চায় না। নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আগে কুয়োর পাশ থেকে চলে যেতে চায়। কুয়োর ভেতরের দেওয়াল বেয়ে ভেঙ্কট বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

দেওয়ালে নখ ঘসার খরখর শব্দ আসছে সেখান থেকে। কুয়ো ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে পতনের শব্দটা আবার শুনল অরিন্দম। দেওয়াল বেয়ে অনেকটা উঠে ভেঙ্কট আবার নিচে পড়েছে, বুঝতে পারল। তার পা চলল না। কুয়োর পাশে এসে দাঁড়াল। ভেঙ্কটের গোঙানি শোনা যাচ্ছে না। লোকটা কি বেহুঁশ হয়ে গেল? হতে পারে। কুয়োর মুখের কাছে গিয়ে অরিন্দম ডাকল, ভেঙ্কট!

ভেঙ্কট সাড়া দিল না। অরিন্দম আবার ডাকল। নিস্তব্ধ কুয়ো। পকেট থেকে দেশলাই বাক্স বার করে, দুহাতে আড়াল করে একটা কাঠি জ্বালল। জ্বলন্ত কাঠিসমেত দুটো আঙুল কুয়োর ভেতরে নামিয়ে দিয়ে ডাকল, ভেঙ্কট!

আবছা আলো কুয়োর তলা পর্যন্ত চলে গেছে। তার গলার আওয়াজ পেয়ে ভেঙ্কট উঠে দাঁড়াল। ভেঙ্কটকে এক পলক দেখে আঁতকে উঠল অরিন্দম। আখমাড়াই কলে মানুষটাকে ছেঁচে নিয়েছে কেউ। রক্তে মাখামাখি মুখ। একটা চোখ যেন গলে গেছে। ফর্দাফাই ছেঁড়া জামার নিচে প্যান্ট নেই। অধোবাস আছে কিনা, অরিন্দম বুঝতে পারল না। ইটের দেওয়াল বেয়ে আবার ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে ভেঙ্কট। কাঠি নিভে আসছে। অস্পষ্ট আলোয় কুয়োর দেওয়ালে পা রাখতে ইটের খাঁজ খুঁজছে ভেঙ্কট। কাঠি নিভে গেল। ভেঙ্কট বলল, বাবুজি একটু আলো।

আর একটা কাঠি জ্বালল অরিন্দম। তারপর আবার একটা, আবার একটা, সাতটা কাঠি পোড়াবার পরে, কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে ভেঙ্কটের হাত ধরে তাকে বাইরে আসতে সাহায্য করল অরিন্দম। কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে ভেঙ্কট প্রথমে জিজ্ঞেস করল, মুরলি কোথায়?

অরিন্দম চুপ। অন্ধকারে টলমল করছে ভেঙ্কটের শরীর। সে দাঁড়াতে পারছে না। দুপায়ের হাড় যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। অরিন্দম কিছু বোঝার আগে কাটা গাছের মত ভেঙ্কট আছড়ে পড়ল মাটিতে। পড়ে কাঠ হয়ে রইল। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে। চারপাশ নিস্তব্ধ। অরিন্দমের মনে হল ভেঙ্কট মারা গেছে। এখনই মারা না গেলে সকালের আগে মারা যাবে। ভেঙ্কটকে ফেলে চলে যাওয়ার কথা অরিন্দম ভাবতে পারল না। হাঁটুমুড়ে নিচু হয়ে ভেঙ্কটের নাকের সামনে হাত পাতল। নিঃশ্বাস পড়ছে। ভেঙ্কটের

কাঁধে হাত রেখে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে অরিন্দম ডাকল, ভেঙ্কট? ভেঙ্কট সাড়া দিল না। আক্রমণকারীরা কথা রেখেছে। ভেঙ্কটের প্যান্টুল খুলে নিয়েছে। প্যান্টের নিচে অধোবাসটা রেখে গেছে। নাকের কাছ থেকে হাত সরিয়ে ভেঙ্কটের বুকে রাখল অরিন্দম। ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড। ভেঙ্কটের মুখে একটু জল দিলে এখনই সে জেগে উঠত। দুঘণ্টা আগে জলের খোঁজে এই কুয়োর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জল পায়নি। বুকফাটা তেষ্টা নিয়ে সে বেহুঁশ হয়ে আছে। ভেঙ্কটের বুকে হাত রেখে তার নাম ধরে অরিন্দম আবার ডাকল। উঁচু গলায় ডাকতে পারছে না। ভেঙ্কটের কানের কাছে মুখ নিয়ে আরও দুবার ডাকতে নড়ে উঠল সে। যন্ত্রণায় অস্ফুট আওয়াজ করে ধীরে ধীরে উঠে বসল। মুরলির খবর অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করল না। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অরিন্দম উঠে দাঁড়িয়েছে। মুরলি কোথায় না জানলেও কী অবস্থায় আছে, অনুমান করতে পারছে। ভেঙ্কটের কান্না সব কথা বলে দিয়েছে। নরম গলায় অরিন্দম বলল, উঠুন, কিলারি যেতে হবে।

ভেঙ্কট একভাবে বসে আছে। অরিন্দম বলল, কিলারি পুলিস-চৌকি থেকে পুলিস নিয়ে মুরলিকে খুঁজতে আসব।

শান্ত গলায় ভেঙ্কট বলল, আপনি যান। মুরলিকে এখানে রেখে আমি ফিরব না।

মুরলি কোথায়?

অরিন্দমের প্রশ্নে ভেঙ্কট চুপ করে থাকল। অরিন্দম বলল, গোঁয়াতুঁমি করে লাভ নেই। পুলিসের সাহায্য না পেলে মুরলিকে উদ্ধার করতে পারবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন।

উঠে দাঁড়াল ভেঙ্কট। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বসে পড়ল। বলল, না, না, তা হয় না। মুরলিকে ফেলে আমি যেতে পারব না।

দেশলাই কাঠি জেলে ভেঙ্কটকে দেখল অরিন্দম। বাইরে থেকে আস্ত দেখালেও মানুষটার মাথা, মুখ, হাত, হাঁটু, পায়ের গোড়ালিতেও রক্ত জমে আছে। মাথার ওপরে তুলে কেউ যেন তাকে পাথরে আছাড় মেরেছে। নিভে যাওয়া কাঠিটা ফেলে দিয়ে ভেঙ্কটের হাত ধরে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল অরিন্দম। জিজ্ঞেস করল. হাঁটতে পারবেন?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভেঙ্কট বলল, পারব। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আমার হাত, পা ওরা ভেঙে দিয়েছে। তিনটে দাঁত পড়ে গেছে। তবু পারব। তার আগে ডানদিকের জঙ্গলটা একবার দেখে যাব। মুরলিকে ওই জঙ্গলে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম ভয় পেল। মুরলিকে যারা ধরে নিয়ে গেছে, তাদের সামনে সে একা যেতে চায় না। ভেঙ্কট পাশে থাকলেও সে একা। জঙ্গলে ঢুকলে বেঁচে ফিরবে না। জেনেশুনে সে আত্মহত্যা করতে চায় না। অচেনা জঙ্গলে মুরলিকে খুঁজবে কোথায়? জলে, কাদায় দুর্গম হয়ে আছে জঙ্গল। মুরলি হয়ত জঙ্গলে নেই। জঙ্গলের পথ ধরে পাশের কোনও গ্রামে তাকে নিয়ে গেছে। সেখানে কোনও পোড়ো বাড়ির অন্ধকার ঘরে। নাহ্, অরিন্দম আর ভাবতে পারছে না। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এখনই সে কিল্লারি রওনা হতে চায়। মুরলিকে নিয়ে লোকগুলো যদি এখনও মেতে থাকে, তাহলে পথে বিপদ ঘটবে না। তবু সাবধানে যেতে হবে। লুটেরাদের একাধিক দল ঢুকেছে গ্রামগুলোতে। এক দলের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আর এক দলের খপ্পরে পড়া অসম্ভব নয়। ভেঙ্কট যেতে না চাইলে সে একা যাবে।

দুহাতে কপাল চেপে ভেঙ্কট ডুকরে উঠল, না, এ হতে পারে না। মুরলির গায়ে আঁচড় পড়েনি। সে ঠিক আছে। লাতুরে তার ছেলে কেশব অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সোলাপুর থেকে সদাশিব এসেছে। স্বামী, ছেলের কাছে তাকে পেঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আমার ছুটি নেই।

দোমড়ানো, রক্তমাখা শরীর, ভেঙ্কটের মগজ যে ক্রমশ বেতাল হচ্ছে, অরিন্দম টের পেল। ভেঙ্কট বলল, আমাকে আধমরা করে কুয়োর মধ্যে ওরা যখন ফেলে দিল, আমার জ্ঞান ছিল। তারপর কয়েক সেকেন্ড ছিল না। দূর থেকে মুরলির গলা শুনে হুঁশ এল। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছিল। আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আমার কপাল, নাক, মুখ, গলা রক্তে চটচট করছিল। কোথায় আছি, ঠাহর করতে পারছিলাম না। মুরলির গলার আওয়াজ শুনতে কান খাড়া করে পড়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। মনে হল, খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম।

এক সেকেন্ড থেমে ভেঙ্কট বলল, হ্যাঁ, খারাপ স্বপ্নই দেখছিলাম। মুরলির গলা দ্বিতীয়বার না শুনে বুঝেছিলাম, তার কান্নার আওয়াজ স্বপ্নে শুনেছি। মুরলির কোনও ক্ষতি হয়নি।

আট

ম্যায় হো গয়ি সওয়া লাখ কি

(ইলা অরুণের গান)

অন্ধকারে গুম হয়ে ভেঙ্কট বসে আছে। তার পিঠে হাত রেখে নরম গলায় অরিন্দম বলল, উঠুন।

ভেঙ্কট উঠল না। ফিসফিস করে বলল, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।

ভেঙ্কটের গলার আওয়াজ শুনে অরিন্দমের মনে হল, কুয়োর ভেতর থেকে সে কথা বলছে। রাস্তা থেকে আরো কিছুটা সরে গিয়ে ভেঙ্কটের মুখোমুখি অরিন্দম উবু হয়ে বসল। ভেঙ্কট বলল, সকাল থেকে আপনার সঙ্গে আমি অনেক তঞ্চকতা করেছি, আর নয়, এবার সত্যি কথাটা বলবো। আমার নাম, ভেঙ্কট নাভালকর নয়, আমি আসলে ভূষণ বিন্দুসার। হ্যাঁ, এটাই আমার নাম। ভেঙ্কট ছিল আমাদের তেলকলের কর্মচারি, ভূমিকম্পের আগের দিন বিকেলে কেশবকে কিলারি থেকে ওমেবগা নিয়ে যেতে এসে ভেঙ্কট বাড়ি ফেরেনি। সবাই জানে সে নিখোঁজ। শুধু আমি জানি, সে পৃথিবীতে নেই। কেশবের সঙ্গে সেও মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। কীভাবে জানলাম, সেটা বলি।

তার আগে নিজের সম্পর্কে দু'একটা খবর আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই। ওমরগা তালুকের পশ্চিমে আমার বাড়ি। ভেঙ্কট থাকত তালুকের পূর্বদিকের একটা গ্রামে। তার বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মুরলির শ্বশুরবাড়ি। ভেঙ্কট ছিল আমার দাদার বন্ধু। দুজনে এক ক্লাসে পড়তো। আমার থেকে বয়সে পাঁচ বছরের বড়ো ছিল আমার দাদা, বিপিন বিন্দুসার। ভেঙ্কটেরও

বয়সও তাই হবার কথা। চল্লিশের বেশি নয়। মুরলিকে আমি চিনি ভেঙ্কটের আগে থেকে। আমাদের পাশের বাড়িতে ছিল মুরলির মামার বাড়ি। আমার চেয়ে চার, পাঁচ বছরের ছোট মুরলি, মামাবাড়িতে এলে তার সঙ্গে কতো খেলেছি। গোল্লাছুট, চোরপুলিশ, লুডো থেকে ঘরে বসে পুতুল নিয়ে খেলা, কিছু বাদ ছিল না। পুতুলের বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করতো মুরলি। কখনও কনে পুতুলের, কখনও বর পুতুলের মা হতো সে। আমাকে কনে পুতুলের বাবা করেছিল একবার। বিয়ের সন্ধেতে আমাকে মুরলির স্বামীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। চমৎকার কাজ চালিয়ে দিয়েছিলাম। সমবয়সীদের সঙ্গে দু'বাড়ির গুরুজনরা তারিফ করেছিল আমার অভিনয়। আমার বয়স তখন দশ, এগারো, মুরলি পাঁচ, ছয়ের বেশি নয়। মুরলির মামাবাড়ির সকলে সেই থেকে আমাকে জামাই বলে ডাকতে শুরু করেছিল। বেশিদিন ডাকার সুযোগ পায়নি। কৌতুকের উল্টোদিকের বিপদটা বাড়ির কেউ কেউ ঠাহর করে সে ডাক থামিয়ে দিয়েছিল। হাঁপ ছেড়ে বেঁচে ছিলাম আমি। 'জামাই' ডাকে মুখ, কান লাল হয়ে ওঠার লজ্জা থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। বয়স আমারও বাড়ছিল। পুতুল খেলার দিন শেষ হল। বেশ কয়েক বছর পরে হঠাৎ একদিন খেয়াল করলাম মুরলিকে। মামাবাড়িতে এসেছিল সে। সেখান থেকে বেড়াতে এসেছিল আমাদের বাড়ি। সঙ্গে ছিল তার ছোট মাসি। আমার মেজদির বন্ধু ছিল সে। মাসির সঙ্গে সেই বিকেলে আমাদের বাড়িতে মুরলি এসেছিল। আমাকে দেখে পুতুল খেলার পুরনো কাহিনী মুরলিকে তার ছোটমাসি মনে করিয়ে দিয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল মুরলি। নির্লজ্জের মতো দেখছিলাম তাকে। আমাকে ধাতানি দিয়ে মেজদি ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল। স্কুলের পড়া শেষ করে ওসমানাবাদের এক তেলকলে আমি তখন চাকরিতে ঢুকেছি। নামে মাত্র চাকরি ছিল সেটা। যৌথ মালিকানার তেলকলে আমার বাবা, উমাকান্ত বিন্দুসারের ছ আনা অংশ ছিল। আমি ছিলাম সেখানে কর্তৃপক্ষের একজন। পদমর্যাদায়, ম্যানেজারের মাইনে পেতাম। তখনও কুড়ি হয়নি আমার বয়স। আমার দাদা, বিপিন কলেজের পড়া শেষ করেনি। তার কাছে মাঝে মাঝে ভেঙ্কট আসতো। স্কুলে

পড়ার সময়ে কদাচিৎ এলেও কলেজে ঢোকার পরে সেটা বাড়লে, আমি লক্ষ করলাম, মামাবাড়িতে মুরলি এলে বিপিনের সঙ্গে ভেংকটের দেখা করার তাগিদ বেড়ে যায়। কিছুদিন পরে জানলাম, মামা-বাড়িতে মুরলি এখন ঘন ঘন আসছে। পাল্লা দিয়ে বিপিনের কাছে ভেংকটের আসা যাওয়া বেড়েছে। কাছাকাছি গ্রামের প্রায় সমবয়সী দু'জন ছেলেমেয়ের একই সময়ে আমাদের পাড়ায় আসার ভেতরের খেলাটা আমি টের পেলাম। দু'জনে শলাপরামর্শ করে আমাদের গাঁয়ে আসছে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ভেংকট, মুরলির ভালোবাসার কাহিনী বিপিন একদিন আমাকে শোনালো।

তাদের মদত দিতে, সে যে কসুর করছে না, তাও জানালো। ঘটনা শুনে আমি প্রথমে দুঃখ পেলাম, তারপর রেগে গিয়েছিলাম। ভেংকটকে হিংসে করতে শুরু করেছিলাম। ভেংকট বুঝতো না। মানুষটা ছিল জলের মতো সরল। মারপ্যাঁচ জানতো না। মুরলির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বিপিনকে যেমন বলতো, আমাকেও না বলে পারতো না। খানিকটা রেখে ঢেকে বলতো। এই সময়ে মারা গেল ভেংকটের বাবা। তার কলেজে পড়া ডকে উঠলো। বড়ো একটা সংসারের ভার চাপলো কাঁধে। জীবিকার ধান্দায় সে জেরবার হয়ে গেল। চাকরির খোঁজে ওসমানাবাদ, লাতুর, শোলাপুর, এমনকি মুম্বাই, হায়দ্রাবাদে গেছে। কোনো সুরাহা হয়নি। শেষপর্যন্ত ওসমানাবাদে, আমাদের তেলকলে তার কাজের ব্যবস্থা হলো। ভেংকটকে চাকরি পেতে সাহায্য করেছিল বিপিন। বাবার কাছে তদ্বির করেছিল। সূর্যমুখী ফুল জোগানের দায়িত্ব পেল ভেংকট। প্রতিষ্ঠানের মাইনে করা ঠিকেদার। খুব মেহনত করতো। মুরলির সঙ্গে দেখা করার সময় পেতনা। দু'জনের যোগাযোগ যতো আলগা হয়ে যাচ্ছিল, ভেংকটকে ততো আঁকড়ে ধরতে চাইছিল মুরলি। ভেংকটের খোঁজে তেলকলে কয়েকবার এসেছে। বেশিরভাগ সময়ে ভেংকট দপ্তরেথাকতো না। জোগানদারদের সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়িতে, ক্ষেতে খামারে তাকে যেতে হতো। সে না থাকলে মুরলিকে খাতির করে আমি বসতাম। চা, জল খাওয়াতাম। বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি একাধিকবার। পুতুলখেলার দিনগুলো আমার মনে পড়তো। মুরলির কি পড়তো না? মুখে

কিছু না বললেও তার হাবভাব দেখে মনে হতো, ছেলেবেলার দিনগুলো সে ভোলেনি। তার গলার স্বরে, কখনও দু'চোখের পাতার ওঠানামা দেখে বুঝতাম, স্মৃতি তাকে ছাড়েনি। তবে পুরনো দিনগুলো নিয়ে সে কখনও মুখ খুলতো না। যতো কথা বলতো, প্রায় সব ভেংকটকে নিয়ে। ভেংকটকে ছেড়ে যে বাঁচবে না, অনেকবার বলেছে। তার কাহিনী শুনে মনের ভেতরটা হিংসেতে জ্বললেও একটা কড়া কথা তাকে বলতে পারতাম না। মনের গোপন এক আশা তখনও মরেনি। ভাবতাম, আমারও দিন আসবে।

মনের মধ্যে ভাবনাটা শেকড় গেড়ে বসেছিল। কীভাবে যেন জানতে পেরেছিলাম, মুরলি কখনও ভেংকটকে পাবে না। শেষপর্যন্ত তাদের বিয়ে আটকে যাবে। ভালহার বর্ণের ভেংকটের সঙ্গে অন্ধ্রের সোসালি বর্ণভূক্ত মুরলির বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। দু'সম্প্রদায়ের মাতব্বররা এ বিয়ে মানবে না। মুরলিকে কখনও ভেংকট পাবে না। তাদের বিয়ে আটকে যাবে। মুরলিকে ভেংকট বিয়ে করলে, সংসার ছেড়ে তাকে পালাতে হবে। নরম মনের মানুষ সে। মা ভাইবোনকে ভালোবাসে। তাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না। মুরলিকে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব। তখন আমি সুযোগ পাবো। আমার পরিবার, পরিজন কম রক্ষনশীল নয়। আমরা কোরি বর্ণ, পেশায় ব্যবসায়ী, বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোক। টাকাপয়সায় এদের আগ্রহ থাকলেও জাতপাতের প্রশ্নে তারা অনড়। জন্মপরিচয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ভেংকটের মতো আমি কমজোরি মানুষ নই। সুযোগ এলে ছাড়বনা। মুরলিকে বিয়ে করব। মুরলির কাছ থেকে তখনই একদিন শুনলাম তার বিয়ের তোড়জোড় চলছে। পাত্র ঠিক হয়ে গেছে। সে পাত্র ভেংকট নয়, আর একজন। তার নাম, সদাশিব দেশপাণ্ডে। ভালহার বর্ণের ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেশপাণ্ডে পরিবারের বৈবাহিক যোগাযোগ আগে হয়েছে। মুরলিকে পছন্দ করেছে তার হবু স্বামী, সদাশিব। ভেংকটের খোঁজে এসে এসব খবর দেওয়ার সময়ে মুরলির দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তার ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে টনটন করছিল আমার বুক। সে একবার বললে, তখনই তাকে বিয়ে করতে পারতাম।

মুরলি বলে নি। আমি জানতাম, ভেঙ্কট বেঁচে থাকতে সে বলবে না। এমন কিছু চিন্তাও করবে না। কথাটা মুরলিকে, বলার সাহস আমারও ছিল না। বলায় ভুল হলো। সাহস ছিল, স্পর্ধা ছিল, তবু বলতে পারিনি। আমাকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল পুরুষালি সঙ্কোচ। মুখ খুলতে দেয়নি। মনের ভেতরে কিছু প্রাচীন সংস্কারও ছিল। ভেঙ্কট আমার দাদার বন্ধু। তার প্রেমিকাকে সুযোগ পেয়ে বিয়ের ইচ্ছে জানানো, ঠিক নয়। অভদ্রতা হবে। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে বিপিন তখনও ওমরগা ফেরেনি।

হায়দ্রাবাদে চাকরি করছে। তার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা শুরু করেছিল মা, বাবা। বিপিনের বিয়ের আগে পছন্দের কোনো মেয়ের সঙ্গে লটকে পড়তে আমার বিবেকে বাঁধছিল। জাতপাত নিয়ে ঝামেলা হওয়ার ভয়ও ছিল। ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। মুরলির দু'চোখ দিয়ে সমানে জল গড়াচ্ছিল। আমার জন্যে মুরলি কাঁদছে না। আমার ইচ্ছের কথা শুনলে সে হয়তো ফোঁস করে উঠত। আমার সামনে থেকে উঠে চলে যেত। তবু তাকে ঘরণী করার চিন্তায় আমি বিভোর হয়ে ছিলাম। বোকা ছিলাম খুব। মেয়েদের ভালোবাসাকে সস্তা ভাবতাম।

সেদিন শেষ বিকেলে ভেঙ্কটের খোঁজে আমাদের দপ্তরে এসেছিল মুরলি। মুরলি আসার দশ মিনিট আগে দপ্তর থেকে ভেঙ্কট বেরিয়ে গিয়েছিল। ভেঙ্কট যে সেদিন আর ফিরবে না, মুরলি-কে বলিনি। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে মুরলি উঠে পড়েছিল। তাকে নিয়ে ৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে একটু ভেতরে এক চিলতে ফাঁকা জমিতে মুখোমুখি বসেছিলাম। এই মরশুমের মতো সে বছরও সূর্যমুখির রেকর্ড ফলন হয়েছিল। সূর্যমুখি ফুল, চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিল আমাদের। হাজার হাজার ফুলে এমনভাবে আমাদের আড়াল করেছিল, যে, রাস্তা থেকে কারো দেখার উপায় ছিল না। পড়ন্ত সূর্যের আলো লেগেছিল মুরলির মুখে। তার ভিজে চোখদুটো চকচক করছিল। কুড়ি বছরের ডাঁটো শরীর থেকে ঠিকরে পড়ছিল সোনালি আভা। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ

খুশিতে ভরে গেল আমার মন। খুশির কারণ, তখনই টের পেলাম। যাই ঘটুক, মুরলিকে ভেঙ্কট পাবে না। আমার কাছে এর চেয়ে বড়ো জয় আর কী হতে পারে! ভেঙ্কটের বদলে অচেনা সদাশিব দেশপাণ্ডের কাছে হার মানতে আমার লজ্জা নেই। চেনা লোকের কাছে মানুষ হারতে চায় না। চেনা লোকটা যদি অধস্তন কর্মচারী হয়, তাহলে হারের ধাক্কা বেশি করে লাগে। আমারও তাই হয়েছিল। বিপিনের সহপাঠি হলেও টাকাপয়সা, পারিবারিক পরিচয়ে আমার চেয়ে অনেক খাটো ছিল ভেঙ্কট। তার কাছে হারতে আমি রাজি ছিলাম না।

ভেঙ্কটের কাছে আসলে আগে থেকে হেরে বসেছিলাম। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে ওমরগা থেকে বিপিন চলে যেতে আমার বন্ধু হয়ে গেল ভেঙ্কট। আমাকে দিয়ে বিপিনের অনুপস্থিতি সে পুষিয়ে নিল। তার কাছাকাছি থাকতে আমারও ভালো লাগত। ঘরে, বাইরে গা ঘসাঘসিতে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। বিপিনের সঙ্গে ভেঙ্কট যে সব গল্প করত, আমাকে বলতে শুরু করল। মুরলির সঙ্গে নানা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ঘটনা শোনাত। আমার গায়ে কাঁটা দিত। হিংসেতে কুঁকড়ে যেত বুক। তবু শুনতাম। শোনার জন্যে মুখিয়ে থাকতাম। ভেঙ্কটকে বিশেষ খোঁচাতে হতো না। মনে আবেগ জাগলে নিজেই বলে যেত। তার বিবরণ শুনে জেনেছিলাম, দাম্পত্য সম্পর্কের শেষ ধাপের আগে তারা থেমে আছে। শেষধাপে পৌঁছোতে আনুষ্ঠানিক বিয়ের অপেক্ষা করছে। তার আগে সেখানে যেতে চায়না। ভেঙ্কটের মনের জোর দেখে তাকে যেমন ভালো লাগতো, তেমনি তাকে খুন করার ইচ্ছে হতো। রাতে, অন্ধকার বিছানায় শুয়ে দেখতাম, তার দাম্পত্য-জীবনের ছবি। মুরলিকে নিয়ে শেষধাপে সে পৌঁছে গেছে। আমার ঘুম ছুটে যেত। ঘাম জমতো কপালে। টের পেতাম, আমি হাঁপাচ্ছি। মনে মনে চাইতাম, বড়োসড়ো ভূমিকম্প হোক। চারপাশ, চেনাজানা কিছু মুখ, মাটির নিচের তলিয়ে যাক। মেয়ে-মানুষ নিয়ে হিংসে, আমাকে কতোটা ইতর করে দিয়েছে, বুঝতে পারতাম। তবু বিষ চিন্তা ঠেকাতে পারতাম না।

সামনে বসে থাকা মানুষটাকে অরিন্দম চিনতে পারছে না। লোকটা কে? অন্ধকার কুয়োর ভেতর থেকে যে মানুষটাকে একটু আগে তুলল, সে কে? ভেঙ্কট নাভালঙ্কার, না ভূষণ বিন্দুসার? অন্য কেউ-ও হতে পারে। লোকটাকে এখন সে কি নামে ডাকবে? অরিন্দম অসুস্থ বোধ করল। মাথা ঘুরছে। কুয়ো থেকে অচেনা কাউকে তুলে এনেছে কি? না, তা করেনি। ভেঙ্কটকে চিনতে ভুল করেনি। কুয়োবন্দি মানুষটাও তাকে চিনেছিল। তার মানে সে ভেঙ্কট। নিজের নাম ভেঙ্কট হঠাৎ পাল্টে ফেলল কেন? কেন নিজের পরিচয় সে অস্বীকার করছে? কেন বলছে, তার নাম ভূষণ বিন্দুসার? রাস্তার কয়েক হাত দূরে ভিজে ঝোপের পাশে কুয়াশার স্তূপের মতো যে লোকটা বসে আছে, সে কি এতোক্ষণ কথা বলছিল তার সঙ্গে? জীবনকাহিনী শোনাচ্ছিল? অরিন্দমের মাথার মধ্যে ধাঁধা লেগে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। তার মনে হল, ঝিঁঝিঁ ডাকছে না। কুয়ো থেকে উঠে অচেনা একজন মানুষ কথা বলছে! ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর সে গুলিয়ে ফেলেছে। ভেঙ্কট এতোক্ষণ একটা কথা বলেনি। ভূষণ বিন্দুসার বলে কেউ নেই। সবকিছু তার ক্লান্ত মগজের ধোঁয়াটে কল্পনা। নিস্তব্ধ মানুষটাকে সে ডাকল, ভেঙ্কট?

কোনো সাড়া পেল না। অরিন্দম আবার বলল, ভেঙ্কট উঠুন! মুরলির বিপদের খবর পুলিশচৌকিতে পৌঁছে দিতে হবে।

মুরলির নাম শুনে কুয়াশার স্তূপ নড়ে উঠল। বলল, আমি ভেঙ্কট নই, ভূষণ বিন্দুসার। ভূমিকম্পের আগের দিন দুপুর কেশবকে আনতে ভেঙ্কট কিলারি গিয়েছিল। মুরলিকে বলেছিল, কিলারিতে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে কেশবকে নিয়ে ওমরগা ফিরবে। ভেঙ্কট ফেরেনি। ফেরার উপায় ছিল না। ভূমিকম্পে দেবদত্ত পিল্লাই-এর বাড়ির সকলের সঙ্গে মাটির নিচে ভেঙ্কটও চাপা পড়ে যায়। পিল্লাই পরিবারের কারো নাম কিলারি ত্রাণশিবিরের মৃতের তালিকায় না উঠলেও আনকো একটা নাম উঠেছিল। পিল্লাই পরিবারের সে কেউ নয়। তার কোউটি যাওয়ার কারণ নেই। তবু

দেখা যাচ্ছে, পিল্লাই পরিবারে, সে এক রাতের অতিথি হয়েছিল। তার নাম ভূষণ বিন্দুসার।

ঝিঁঝির একঘেয়ে ডাকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভেংকট কথা বলে যাচ্ছে। মাটিতে থেবড়ে বসে থাকা আধা উলঙ্গ লোকটা যে ভেংকট, এ নিয়ে অরিন্দমের সন্দেহ নেই। আগেও ছিল না। তবু মাথার মধ্যে ধোঁয়াটে ধাঁধা জমতে শুরু করছিল। ভূষণ বিন্দুসারের কাহিনী ফেঁদে, তার মৃত্যুর খবর দিয়ে সে ধাঁধা এখনই ভেংকট কাটিয়ে দিল। আসল কথাটা, ঝোঁকের বশে বলে দিয়েছে। কোউটি থেকে ফেরার পথে অরিন্দম টের পেয়েছিল, ভেংকটের বোধবুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। তার দেওয়া বিবরণ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক ঘণ্টায় সেটা বেড়েছে। কুয়োর মধ্যে পড়ার সময়ে মাথায় হয়তো চোট লেগেছিল। স্মৃতি বেতাল হয়ে গেছে। নিজেকে ভাবছে ভূষণ বিন্দুসার। এরকম হতেই পারে।

অরিন্দম বলল, ভেংকট উঠুন। ফিরতে হবে।

মানুষটা বলল, আমি ভেংকট নই, ভূষণ বিন্দুসার। ভেংকট মারা গেছে। দেবদত্ত পিল্লাই-এর বাড়ি খুঁড়ে ফৌজিরা যে লাশ পেয়েছিল, সেটা চিনতে পারেনি। চিনতে ভুল করেছে। মৃত ভেংকটের শার্টের পকেটে ছিল, সূর্যমুখীর হিসেব সমেত আমার নাম লেখা এক টুকরো কাগজ। বকেয়া হিসেব মেটাতে কাগজটা আমি দিয়েছিলাম তাকে। কাগজে লেখা নামটা দেখে ভেংকটকে তারা ভূষণ বিন্দুসার ধরে নিয়েছে। মৃতের তালিকায় উঠে গেছে জ্যান্ত ভূষণের নাম। ভূমিকম্পের পাঁচদিন পরে কিলারি ত্রাণশিবিরের দেওয়ালে টাঙানো প্রথম তালিকায় ভূষণ বিন্দুসারের নাম দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কী ঘটেছে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কেশব আর ভেংকটের খোঁজে আমাকে কিলারি পাঠিয়েছিল মুরলি। কিলারিতে কী ঘটেছে, বুঝতে পেরেও মুরলিকে বলিনি। কেন বলিনি? কিলারি ত্রাণশিবিরে মৃতের তালিকায় ভূষণ বিন্দুসারের নাম দেখে আমার মাথায় কুচিন্তা চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। চারপাশে শ্মশান। ত্রিশ হাজার মানুষ পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। তাদের আত্মীয়স্বজনের কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে আকাশ। তার

মধ্যে শয়তান ভর করল আমাকে। মুরলির কাছে ভেঙ্কটের যা পাওনা ছিল, আর ভেঙ্কটের যা মুরলিকে দেওয়ার ছিল, সব আমি একা গুণে গেঁথে নিতে চাইলাম, আমি ভেঙ্কট ঠাওরালাম নিজেকে।

তবু সন্দেহ জেগেছিল মনে। ভেঙ্কট সত্যি মরেছে কিনা, যাচাই করতে তলনি গেলাম। ভূমিকম্পে তলনির কম ক্ষতি হয়নি। বাতাসে মিশে ছিল মৃত্যুর গন্ধ আর হাহাকার। ঘরবাড়ির পঞ্চাশ ভাগ মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। অনেক মানুষ নিখোঁজ। তার মধ্যে খবর পেলাম ভেঙ্কটের শ্বশুর বিলাস মুত্তামসারের পরিবারে আঁচড় লাগেনি। কচি মেয়ে নিয়ে ভেঙ্কটের স্ত্রী সরসী সুস্থ আছে। দুর্ঘটনার সাতদিন আগে শেষবার ভেঙ্কট এসেছিল তলনিতে। পাঁচদিন থেকে চলে গেছে। আর আসেনি। তলনি থেকে পাওয়া খবরের খানিকটা আমি জানতাম। ভূমিকম্পের দশ দিন আগে দপ্তরে বসে ভেঙ্কট বলেছিল যে, তলনি থেকে কেশবকে আনতে সে কিলারি যাবে। মুরলিকে কথা দিয়েছে। যা জানতাম না, তাও জানলাম। সে কথা রেখেছে। তলনিতে ভেঙ্কট নেই। ভূমিকম্পের পরে সে তলনি যায়নি। গিয়েছিল সাত দিন আগে, আর কখনও যাবেনা, একথা কেউ জানে না। আমিও বলিনি। ভেঙ্কটকে বাঁচাতে হলে ভূষণকে মরতে হতো। মুরলির কাছে আমি ঘেঁষতে পারতাম না। তা কেন হতে দেবো? মুরলির কাছে আমার অনেক পাওনা আছে। পুতুল খেলার বয়সে, বাবা সেজে আমরা যে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম, আজ আমি কেন তার বাবা হতে পারবো না? ভেঙ্কটের কাছে মুরলি যদি বাচ্চা চাইতে পারে, আমার কাছে কেন চাইবে না? নিশ্চয় চাইবে। আমি জানি, সে আমাকে পছন্দ করে। আমাকে দেখে খুশি হয়। তার চোখের সামনে থেকে চিরকালের মতো ভেঙ্কট সরে গেলে সে আমাকে আরো আঁকড়ে ধরবে। আমার ওপর তার নির্ভরতা বাড়বে।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে ছায়ামূর্তি থামল। অরিন্দমের সব জিজ্ঞাসা জট পাকিয়ে গেছে। সে এখনই পালাতে চায়। নিঃশব্দে দৌড় দিলে কেমন হয়? তাই ভালো। এখানে আরো কিছুক্ষণ

থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। ঝিঁঝি পোকার ডাকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে লোকটা বলল, দুনিয়ার ভোল বদলে গেছে। ভূমিকম্পে মাটির সঙ্গে বাতাসও কেঁপে ওঠে। সব গুলিয়ে যায়। এবার মানুষও ওলোটপালোট হয়ে গেছে। বদলে গেছে বাপপিতামোর নাম। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ার মতো তাদের ভেতরের চেহারা বেরিয়ে এসেছে। আমারও। মুরলির সঙ্গে হিসেব না চুকিয়ে আমি নড়ব না।

মাথার মধ্যে ধাঁধা লেগে গেলেও অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, মুরলির স্বামী সদাশিব দেশপান্ডে কোথায়?

তাকে আমি খুন করেছি।

জবাব শুনে অরিন্দম পাথর হয়ে গেল। মেঘ ডাকল আকাশে। ঝিঁঝি পোকার সঙ্গে আরো কিছু কীটপতঙ্গ গলা মিলিয়েছে। লোকটা বলল, না, আমি নই, সদ্যাশিবকে খুন করেছে ভেঙ্কট। খুন করে গা ঢাকা দিয়েছে। না, ঠিক গা ঢাকা দেয়নি। ভুষণ বিন্দুসার সেজে লুকিয়ে আছে। মুরলি সব জানে!

অরিন্দম এতোক্ষণে ভয় পেয়েছে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার গলা। সামনে মানুষটা কে? ভেঙ্কট, ভূষণ, না পিশাচ? একজন উন্মাদের সঙ্গে কথা বলছে, বুঝতে পেরেছে। টলমল পায়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল। অরিন্দম টের পেল, তার বুকের ভেতরটা কাঁপছে। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা দুরমুশের মতো করে ঝোপের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। চমকে উঠল অরিন্দম।

পালানোর এমন সুযোগ আর মিলবে না। ভূতুড়ে লোকটার জন্যে তার কোনো মমতা নেই। রাস্তার দিকে পা বাড়িয়ে একবার পেছনে তাকাল সে। ঝোপের মধ্যে পাথরের মতো মানুষটা পড়ে আছে। মারা গেল নাকি? দুপুর থেকে বারবার ঘুরে যাচ্ছে ঘটনার গতি। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, অরিন্দম বুঝতে পারছে না। বাস্তবতার এমন বহুরূপী চেহারা, সে আগে দেখেনি। শব্দহীন বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ছে চারপাশ। ভাঙন সহজে দেখা যায়না।

ভূমিকম্পে মাটি চৌচির হয়ে যেতে অদেখা অনেক ফুটোফাটা

থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃশ্যপট। সত্য, মিথ্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার রাস্তায় একটু আগে মুরলির হাত ধরেছিল সে। ভেংকটকে শায়েস্তা করতে একা মুরলিকে নিয়ে লাতুরে পালাতে চেয়েছিল। ভেংকট বুঝতে পারেনি। মুরলি বুঝেছিল। তারপর সারা পথ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভেংকটের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার সংকেত মুরলি পাঠিয়েছিল। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও তেতে উঠছিল অরিন্দম। সে অনুভব করছিল, মৃত্যুর ঘেরাটোপে ঢাকা এই পরিবেশে কেউ তাকে দেখবে না। দেখলেও মনে রাখবে না। এখানে ন্যায়, অন্যায় নেই। মানুষের সব বোধ, মৃত্যু মুছে দিয়েছে। ছেলের খোঁজে সকালে ওমরগা থেকে যে মুরলি গাড়িতে উঠেছিল, কিলারিতে এসে সে বদলে গেছে। গায়ে গা ঠেকিয়ে যে মেয়েটা হেঁটে চলেছে, সে সদাশিব দেশপাণ্ডের বৌ নয়, কেশবের মা, ভেংকটের প্রেমিকা নয়, সে অন্য মুরলি। তার কোনো পিছুটান নেই। শক্তসমর্থ, নির্ভরযোগ্য একজন পুরুষের হাত ধরে যে কোনো দিকে সে ভেসে যেতে পারে। ভেংকটের বদলে ভূষণ বিন্দুসারকে বেছে নিতে তার দ্বিধা করার কথা নয়। দ্বিধা সে করেনি।

মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষকে ফেলে চলে যেতে গিয়েও অরিন্দম ফের ঝোপের কাছে ফিরে এল। মাটি থেকে মানুষটা উঠে বসল। তার মুখ আবছা দেখতে পাচ্ছে অরিন্দম। পলকহীন চোখে লোকটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। সাহস করে অরিন্দম বলল, ভেংকট চলুন। মুরলির খবর পুলিশ চৌকিতে দিতে হবে। ভেংকট চুপ। আত্মপরিচয় নিয়ে তর্ক জুড়ল না। বলল না, আমি ভেংকট নই, ভূষণ বিন্দুসার।

অবাক হলো অরিন্দম। ধীরে ধীরে ভেংকট উঠে দাঁড়াল। বলল, মুরলিকে না নিয়ে আমি ফিরতে পারবো না।

অরিন্দম কথা বলল না। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ভেংকট বলল, মাথার ভেতরটা ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। কি একটা কথা মনে করতে পারছি না। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভুলে যাওয়ার আগে ঘটনাটা আপনাকে জানিয়ে

রাখি। আমার জন্যে ভূষণ বিন্দুসার মাটি চাপা পড়ে মারা গেছে। আমার বন্ধু ছিল সে। ভীষণ বন্ধু। মুরলিকে খুব ভালবাসতো। মুরলি জানতো। ভূষণের জন্যে কষ্ট পেত। তার কিছু করার ছিলনা। আমার কথা শুনে কেশবকে আনতে ভূমিকম্পের আগের দিন বিকেলে কিলারি গিয়েছিল ভূষণ। সে ফেরেনি। তার মা, বাবা, বাড়ির কেউ খাবারটা জানে না। তাদের কাছে আমিই বা বলবো কি করে? ভূষণ যে আমার জন্যে মরেছে, আমি জানি। সারাক্ষণ সে তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে। আমিও হয়তো মরবো। কেশবকে না নিয়ে মুরলি ঘরে ফিরবে না। কেশবকে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। মুরলি মরবে। আমাকেও মরতে হবে। কেশবকে বাদ দিয়ে মুরলির কাছে আমার কোনো দাম নেই।

একটু আগে যে লোকটা নিজেকে ভূষণ বলে পরিচয় দিয়েছিল, এখন অন্যকথা বলছে। হারানো স্মৃতি ভেঙ্কট কি ফিরে পেল? এ লোকটা কি সত্যি ভেঙ্কট? অরিন্দম আর ভাবতে চাইল না। ঝিমঝিম করছে মাথা। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

অশক্ত পায়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙ্কট শরীরে জোর পেয়েছে। বলল, আমি যাই। জঙ্গলে কোথাও মুরলি লুকিয়ে আছে। আমাকে দেখলে বেরিয়ে আসবে।

কথা থামিয়ে পাগলের মত ভেঙ্কট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, মুরলি!

চমকে গেল অরিন্দম। ভেঙ্কট মৃত্যু ডেকে আনছে। এখান থেকে এখনই সরে পড়া দরকার। ভেঙ্কট ডুকরে উঠল, ভগবান, এ তুমি কী করলে!

ভেঙ্কটের চোখে জল নেই, শুকনো গলা। প্রবল কান্নায় হেঁচকি উঠছে। অরিন্দমকে কিছু না বলে জঙ্গলের দিকে সে হাঁটতে শুরু করল। তাকে আটকাল না অরিন্দম। মুরলির নাম ধরে ভেঙ্কট চেঁচিয়ে উঠতে অসম্ভব ভয় পেয়ে গেছে সে। ভেঙ্কটকে সঙ্গী করে এতটা রাস্তা যাওয়ার সাহস তার নেই। ভেঙ্কটও যাবে না। মুরলিকে না নিয়ে কিলারি ফিরবে না। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে ভেঙ্কট। রাস্তা ছেড়ে জলাজমি দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। ভেঙ্কট জঙ্গলে ঢোকার আগে পর্যন্ত অরিন্দম নড়ল না।

এখনও সে ভেবে পাচ্ছে না, লোকটা কে? ভেংকট হতে পারে। ভূষন হতে পারে। অন্য কেউ হওয়া অসম্ভব নয়। নিস্তব্ধ গ্রাম। কোথাও মানুষের সাড়া নেই। সেই পাগলটা পর্যন্ত বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কিলারির দিকে পা বাড়াল অরিন্দম। কত রাত এখন? সাড়ে দশটার কম নয়। এগারটা হতে পারে। কিলারিতে গাড়ি নিয়ে মজিদ অপেক্ষা করছে। তার দেরি দেখে হয়ত পুলিসচৌকিতে খবর দিয়েছে। কলকাতার একজন নিপাত্তা সাংবাদিককে পুলিস কি খোঁজাখুঁজি করবে? ত্রিশ হাজার মানুষ মারা যাওয়ার পরে কি সে তাগিদ থাকে? আকাশের দিকে চোখ পড়তে একফালি চাঁদ দেখতে পেল অরিন্দম। দেখে অবাক হল। কালচে লাল মেঘ সরিয়ে কখন চাঁদ উঠল, খেয়াল করেনি। শুক্লপক্ষের চাঁদের মিহি আলো পৃথিবীতে নেমে এসেছে। আর পথ ভুল হবে না। রাস্তার অন্ধকারে গা ঢেকে নিঃশব্দে অরিন্দম হাঁটছে। খিদে, তেষ্টা, ক্লান্তি মুছে গেছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে কপাল থেকে। মুরলি এখন কোথায়? জঙ্গলে ভেংকটের মিলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তটা অরিন্দমের মনে পড়ল। সামনে, অন্ধকার রাস্তা থেকে অস্পষ্ট এক আওয়াজ ভেসে আসছে। আওয়াজটা চেনা। অরিন্দম সজাগ হল। আওয়াজ বাড়ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দুটো হেডলাইটের আলো নজর করল। জিপগাড়ির ইঞ্জিনের শব্দটা সমুদ্রের ধ্বনির মত শোনাচ্ছে।

নয়

ম্যায় ছপন ছুড়ি মাতোয়ারি
ম্যায় তেজ ধারওয়াড়ি
কে দিল্ কো চির ডালুঙ্গি
(ইলা অরুণের গান)

জিপ থেকে নেমে, অরিন্দমের পাশে দাঁড়িয়ে, পুলিস অফিসার, ভুজবল মালব্য বলল, ওফ্, বাঁচলাম। আপনাকে না পেলে আমাকে জবাবদিহি করতে হত।

জিপগাড়ির দুটো হেডলাইট জ্বলছে। জোরালো আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সামনের রাস্তা, বাড়িঘর। লম্বা, পেটানো শরীর, ভুজবলের বয়স চল্লিশ। দু-এক বছর বেশি হতে পারে। পরিষ্কার করে কামানো মুখ! কথাবার্তায় যথেষ্ট ভদ্র। হেডলাইটের আলোয় দূর থেকে জিপচালক দেখেছিল অরিন্দমকে। তার নজরে পড়তে মাঝরাস্তা দিয়ে অরিন্দম হাঁটছিল। ড্রাইভারের পাশে বসেছিল ভুজবল। জিপ থামতে আগে সে নামেনি। ফাঁকা রাস্তায় অরিন্দমকে দেখে জিপ থেকে চটপট নেমে চার বন্দুকধারী সিপাই প্রথমে তাকে ঘিরে ফেলেছিল। মাথার ওপর দু'হাত তুলে নিজের পরিচয় দিয়ে রেহাই পেয়েছিল অরিন্দম। তাক করে রাখা রিভলভার পকেটে পুরে জিপের বাইরে এসে ভুজবল বলেছিল, চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন পত্রকারসাব!

অরিন্দমকে ছেড়ে অদৃশ্য শত্রুদের ঠেকাতে বন্দুকধারীরা জিপ ঘিরে মালার মত দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে আছে শিখ জিপচালক। অরিন্দমকে অবাক হয়ে দেখছে। ভুজবল জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গী দু'জন কোথায়?

মুরলি, ভেঙ্কটের বিবরণ শুনে কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থেকে ভুজবল বলল, কাল সকালে ওদের খোঁজ করব। চৌকিতে পৌঁছে

প্রথমে আপনি একটা এজাহার লেখান। আপনার যা খোয়া গেছে, সব লিখবেন। দেখি, কী করা যায়।

হেডলাইটের আলোয় যতদূর চোখে পড়ে, নজর করে ভুজবল বলল, কিলারিতে আপনার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আপনি তো লাতুরে যাবেন ?

অরিন্দম কিছু বলার আগে হাতের ঘড়ি দেখে ভুজবল বলল, কিলারি থেকে আধঘণ্টার মধ্যে স্টার্ট করলে লাতুর পেঁছিতে সাড়ে বারোটা বাজবে। তা হোক। রাস্তা ভাল। অসুবিধে হবে না।

ভুজবল কী চায়, টের পেলেও অরবিন্দ বলল, মালব্যসাহেব, সামনের গ্রাম পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এলে ক্ষতি কি ? ভেঙ্কট, মুরলিকে হয়ত রাস্তায় পেয়ে যাব।

অরিন্দমের কথায় গম্ভীর হল ভুজবলের মুখ। বন্দুকধারী চার সিপাইকে একবার দেখে নিয়ে বলল, এই ফোর্স নিয়ে গ্রামের আরও ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না।

আমার খোঁজে যখন ঢুকেছেন, আর একটু দেখে যান।

অনিচ্ছে নিয়েই ভুজবল বলল, চলুন। লাতুরে পেঁছিতে আপনার কিন্তু দেরি হয়ে যাবে।

অরিন্দম কথা বাড়াল না। চার সিপাই জিপের পেছনে গিয়ে বসল। জিপের সামনে, ভুজবল আর ড্রাইভারের মাঝখানে বসল অরিন্দম। আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ দিগন্ত ছেড়ে চাঁদ কিছুটা ওপরে উঠেছে। আলোর তেজ বেড়েছে। মুরলির খোঁজে জঙ্গলের ভেতরে ভেঙ্কট একা ঢুকে যাওয়ার পর থেকে অরিন্দম অস্বস্তি বোধ করছিল। দুজনকে বিপদের মুখে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে, এই অনুভূতি তীব্র হয়েছিল। চলে আসার যুক্তি সাজাচ্ছিল মনে মনে। সে সাংবাদিক। ভূমিকম্পের খবর করতে অফিস থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে। অফিস তাকে মাইনে দেয়। অফিসের কাজে এসে সমাজসেবা করা যায় না। সে হিন্দি ছবির নায়ক নয়। মধ্যবিত্ত, সংসারী মানুষ। একদল খুনের হাত থেকে মুরলিকে বাঁচানো তার পক্ষে অসম্ভব। নিজের ক্ষমতা সে জানে। তার বাইরে গিয়ে কিছু করতে চায় না। পুলিসকে মুরলি, ভেঙ্কটের বিপদের খবর পেঁছে দিতে পারে। ব্যস,

তার বেশি নয়। তবু অপরাধবোধ খোঁচাচ্ছিল তাকে। কিলারি পুলিস-চৌকিতে খবর দিয়ে গাড়ি চেপে লাতুর চলে গেলে অস্বস্তি তাকে জড়িয়ে থাকত। ভুজবল টহলে রাজি হয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। মুরলিকে খুঁজতে ভুজবলকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকবে। সে চাপ দিলে ভুজবলকে যেতে হবে। তাকে না নিয়ে ভুজবলের কিলারি ফেরার উপায় নেই। সুযোগটা সে কাজে লাগাবে। তবে ভুজবলের বাহিনীর চেয়ে লুটেরারা সংখ্যায় বেশি। তারা নিরস্ত্র নয়। সব জেনে ভুজবল কতটা এগোবে, বলা মুশকিল। অরিন্দমও ঝুঁকি নিতে চায় না। কৌশিকীকে আজ ফোন না করলে রাতটা জেগে কাটিয়ে দেবে সে। তার পেটের শিশু কষ্ট পাবে। পৃথিবী জুড়ে সেই শিশুর কান্না শোনা যাবে। অরিন্দম কান্না শুনতে চায় না।

জিপের আলো কমছে, বাড়ছে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিনের শব্দ। তেমাথার কাছাকাছি জিপ এসে গেছে। মুরলিকে নিয়ে লোকগুলো যেখানে থাকুক, ইঞ্জিনের আওয়াজ তাদের কানে যাবে। কী করবে তারা? মুরলিকে ফেলে পালাবে? পালাতে পারে। জিপের আওয়াজ শোনার আগেই হয়ত মুরলিকে ছেড়ে তারা চলে গেছে। চার-পাঁচজনে মিলে মুরলির শরীর কতক্ষণ ধ্বস্ত করতে পারে? নির্যাতনের মাঝখানে মুরলি নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়েছিল। অচেতন মুরলিকে খুব বেশি আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেষাই করেছে। সে নিষ্পেষণ সাংঘাতিক। মুরলি বেঁচে আছে তো? প্রশ্নটা মনে আসতে অরিন্দম থতমত খেল। মুরলিকে ভেংকট খুঁজে পেয়েছে কি? ভুজবল বলল, ত্রিশ হাজার মানুষ মারা যাওয়ার পরে, যারা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকার বোধটা তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কাছে প্রাণের কোনও দাম নেই। বাঁচা-মরা নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে চাইছে না। খুনি, লুটেরারা খোলা ময়দান পেয়ে যা খুশি, তাই করছে। দেখার কেউ নেই, অভিযোগ করার কেউ নেই। অভিযোক্তা না থাকলে অপরাধ নজরে পড়ে না। আমরা কিছুই জানতে পারছি না। কোর্টটিতে আপনাদের তিনজনকে খুন করে ফাঁকা মাঠে চিতায় তুলে জ্বালিয়ে দিলে আমরা জানতে পারতাম না।

মাঝরাতে মাঠের মধ্যে আগুন দেখে লোকে ভাবত, ভূমিকম্পে মৃত মানুষের লাশ পুড়ছে। সরকারি লাশ। ত্রাণদপ্তর পোড়াচ্ছে। পুলিশ দেখতে যেত না, কারা পুড়ছে, কারা পোড়াচ্ছে। সব জেনেও আমাদের বলতে হত, কোউটিতে যে তিনজন গিয়েছিল, তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। তারা নিখোঁজ।

ভুজবল কী বলতে চাইছে, অরিন্দমের বুঝতে অসুবিধে হল না। কোউটিতে যাওয়া হঠকারিতা হয়েছে। তিনজনের মধ্যে সে না থাকলে, এই রাতে জিপ নিয়ে ভুজবল টহলে বেরত না। অরিন্দমের দিকে না তাকিয়ে ভুজবল বলল, তবে মানুষের আচরণে হেঁয়ালি আছে। সবটা বুঝি না। আজ দুপুরে কিলারি তালুকের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের নামের নাম দেউড়ি। দু'সপ্তাহ ধরে রেশন দেওয়া চলছে সেখানে। রেশন নিতে লম্বা লাইন পড়ছে। গোলমাল, হাতাহাতি লেগে আছে। গাঁয়ের বাইরে থেকে লোক আসছে রেশন নিতে। রেশন যারা নিচ্ছে, সকলে গাঁয়ের লোক কিনা যাচাই করতে গিয়ে দেখি, রেশন লাইনের চেয়ে সামনের তাঁবুতে বেশি ভিড়। হৈচৈ হচ্ছে সেখানে। আইনশৃঙ্খলার সমস্যা ভেবে গিয়ে দেখি, অন্য ঘটনা। ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে উনিশ দিনের এক শিশু। ভূমিকম্পের আগের সকালে সে জন্মেছিল। জন্মের পর থেকে একদম কাঁদেনি। রাতে, মা সমেত মাটি চাপা পড়ে। মাটির নিচে ছিল বাহাত্তর ঘণ্টা। তিনদিন পরে তাকে উদ্ধার করা হয়। মা মারা যায়। মায়ের শরীরের আড়ালে বাচ্চাটা ছিল। বাচ্চাটা বেঁচে ছিল। নীল হয়ে গিয়েছিল তার শরীর। বুকের মধ্যে প্রাণটা ধুকপুক করছিল। বাঁচার কথা নয়। তবু বেঁচে গেল। কীভাবে বাঁচল, জানি না। খানিকটা চাঙ্গা হয়েও ছেলেটা কাঁদেনি। আজ দুপুরে প্রথম কাঁদল। তার কান্না শোনার জন্যে সে কি ভিড়। খুশিতে ফেটে পড়ছে সবাই। রেশন নিতে ভুলে গেছে। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে আমি বেকুব বনে গেলাম। অবাকও হলাম। এত লোক মারা যাওয়ার পরে, একটা বাচ্চার কান্না শুনতে কীভাবে মানুষ ভিড় করে, কান্না শুনে আহ্লাদে হৈহৈ করে, ভেবে পেলাম না। বুঝলাম অনেক কিছু বোঝার বাকি আছে।

এক সেকেণ্ড থেমে ভুজবল বলল, দিন কয়েক আগে ত্রাণশিবিরে নিউমোনিয়ায় মৃত একটা বাচ্চার মা আছড়ে-পিছড়ে কাঁদছিল। সে দৃশ্য দেখা যায় না। পাড়সালগির কাছে শুনলাম, মেয়েটার স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ি, দেওর ভূমিকম্পে মারা গেছে। তারও বাঁচার কথা নয়। ছাত চাপা পড়েছিল সে। দু'বছরের ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছিল। মা, ছেলে বেঁচে গিয়েছিল। আটচল্লিশ ঘণ্টা বেহুঁশ ছিল দু'জন। জ্ঞান ফেরার পরে স্বামী আর পরিবারের অন্যদের মৃত্যুর খবর শুনে মেয়েটা মুখ কালো করেছিল। চোখের জল ফেলেনি। ছেলে মারা যেতে সেই মেয়ে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদছে, কান্নার চোটে থেকে থেকে জ্ঞান হারাচ্ছিল। অন্য কাজে আমি চলে গিয়েছিলাম। মেয়েটার খবর আর নেওয়া হয়নি। তবে বেশ ধাঁধা খেয়ে গেছি। মানুষের তল খুঁজে পাচ্ছি না। জীবন আর মৃত্যু, দুটোই নতুন চেহারা নিচ্ছে। যেসব আত্মীয়, বন্ধুদের মৃত্যু, নিজের চোখে দেখেছি, সেই সব মৃত্যুদৃশ্য মনে পড়ছে। টের পাচ্ছি, সবটা দেখিনি। যা দেখেছি, তা ওপর-ওপর। বেঁচেও আছি সেভাবে।

ভুজবলের কথা শুনে নড়েচড়ে বসল অরিন্দম। মৃত্যু নিয়ে তার মত আরও একজন ভাবছে, সে কল্পনা করেনি। ভুজবলের চৌকো মুখের দিকে সে তাকাল। জিপ নিয়ে মানুষটা কেন তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না। ভাঙাচোরা রাস্তায় সাবধানে জিপ চলেছে। রাস্তার সেই তেমাথা সামান্য দূরে। বাঁদিকে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। বড়সড় গর্তে পড়ে জিপ লাফিয়ে উঠল। জল ছেটানোর শব্দ শুনল অরিন্দম। জঙ্গলে ঢোকার মুখে এসে ভুজবলকে অরিন্দম গাড়ি থামাতে বলল। ভুজবল তাকাল অরিন্দমের দিকে। ড্রাইভারকে হুকুম দিল, গাড়ি রোকো।

জিপ থামল।

অন্ধকার জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে অরিন্দম বলল, মুরলিকে লোকগুলো এই জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গেছে। তাকে খুঁজতে ভেঙ্কট জঙ্গলে ঢুকেছে।

জঙ্গলের দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে ভুজবল বলল, আমরা কিন্তু আপনার সঙ্গীদের খুঁজতে এখন জঙ্গলে ঢুকতে পারব না। যা করার

কাল সকালে করব।

জীবন-মৃত্যু নিয়ে যে ভুজবল কথা বলছিল, এ তার গলা নয়। পুলিসের মত ভুজবল কথা বলল। অরিন্দমের মনে হল, ভুজবলকে বুঝতে তার ভুল হয়েছে। খিদে পেয়েছিল অরিন্দমের। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছিল। বলল, তাহলে ফিরে যাই। পরশুর সংবাদ-পত্রে আমি খবরটা করব। ছেলের খোঁজে আসা যুবতী মাকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেছে।

কথাটা শুনে ভুজবল দমে গেল। মুখে বলল, আপনি খবর করলে আমার কিছু করার নেই। আমি জানি, মহিলাকে এখন জঙ্গলে পাওয়া যাবে না। বৃষ্টি বাদলে মেয়েছেলে নিয়ে ডাকাতরা খোলা আকাশের নিচে থাকবে না। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাঁয়ে যাওয়ার রাস্তা আছে। সেখানে কিছু বাড়ি আস্ত আছে। বাড়িতে খাড়া আছে কয়েকটা ঘর। ডাকাতরা সেখানে ডেরা গেড়েছে। দুটো ডেরা এর মধ্যে খুঁজে বার করে আমরা তল্লাশি চালিয়েছি। ফায়ার আর্ম পেয়েছি, চোরাই মাল পেয়েছি। সেই ডেরা দুটো একবার ঘুরে যেতে পার। রাস্তার অবস্থা খারাপ। সাবধানে যেতে হবে। মনে হয়, আপনার বন্ধুদের সেখানে পাওয়া যাবে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে চাইছিল অরিন্দম। ইচ্ছেটা সে জানাতে ভুজবল বলল, জঙ্গলের পথে আপনি যেখানে পেঁছবেন, জিপেও সেখানেই যাবেন।

হয়ত তাই। তবু আমি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে চাই। আমার মনে হচ্ছে, জঙ্গল থেকে ভেঙ্কট বেরতে পারেনি।

অরিন্দমের একগুঁয়েমিতে ভুজবল বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলল না। জিপ থেকে নেমে ডাকল, কক্কর?

জিপের পেছন থেকে তাগড়া শরীর এক সিপাই নেমে এল। সে-ই যে কক্কর, অরিন্দমের বুঝতে অসুবিধে হল না। অরিন্দমের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাঁ পর্যন্ত, কোন পথে, কীভাবে তাকে যেতে হবে, ভুজবল বলে দিল। পাঁচ ব্যাটারি টর্চটা সঙ্গে নিতে বলল।

জিপের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে অরিন্দম। জায়গাটা চেনা। এক ঘণ্টা আগে এখানে সে ছিল। জিপের হেডলাইট জ্বলছে। চাঁদ

মাঝ আকাশে। কক্করকে নিচু গলায় ভুজবল বলল, দরকার হলে ফায়ার করবে। আমরা এসে যাব।

বিরাট শরীর কক্কর নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। জিপে উঠে বসল ভুজবল। জিপ স্টার্ট নিতে কক্করের সঙ্গে জঙ্গলের দিকে অরিন্দম পা বাড়াল। বন্দুক বাগিয়ে ধরেছে কক্কর। অরিন্দমের হাতে টর্চ। জঙ্গলের দিকে দুজন রওনা হতে জিপ ছেড়ে দিল। অরিন্দমকে হাত নাড়ল ভুজবল। পাঁচ ব্যাটারি টর্চের আলো জঙ্গল ফুঁড়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘন জঙ্গল নয়। ইতস্তত ছড়ানো লম্বা গাছ, মাঝে মাঝে ঝোপ, সব অচেনা। পায়ে চলা পথ বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। কাদা না থাকলেও পিছল পাথুরে রাস্তায় সাবধানে হাঁটছে অরিন্দম। নিস্তব্ধ জঙ্গল। জিপের আওয়াজ ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে। ব্যাঙেরা চুপ। শিয়াল ডাকছে না। গাছের মাথায় চাঁদের আলো পড়ছে। টর্চ নিভিয়ে অরিন্দম দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাল। তার সঙ্গে তাল রেখে কক্কর হাঁটছে। সে দাঁড়াতে, তার শরীর ঘেঁষে কক্কর দাঁড়িয়ে গেল। গাছের মাথা থেকে চাঁদের আলো নিচে নেমে এসেছে। পায়ের পাশ দিয়ে খরগোশের মত কিছু দৌড়ে চলে গেল। টর্চ জেবলে জীবটাকে অরিন্দম দেখতে পেল না। তার বদলে যা দেখল, সেটা কম নয়। নিচু হয়ে মাটি থেকে কাচের চুড়ির একটা টুকরো তুলে নিল। মুরলির ভাঙা চুড়ি, চিনতে ভুল হল না। মুরলিকে এই পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চুড়ির টুকরো দেখে টান-টান হল কক্করের শরীর। নিঃশব্দে ঘ্রাণ নিল সে। তার পা ফেলার ভঙ্গিতে অরিন্দমের মনে হল, ডিনামাইটের ওপর দিয়ে সে হাঁটছে। গা ছমছম করছে অরিন্দমের। মনে হচ্ছে, বাঘের গুহায় ঢুকছে। লোকগুলো বাঘের চেয়ে সাঙ্ঘাতিক। কাছাকাছি আছে। মুরলিকে নিয়ে নিজেদের ডেরায় যায়নি। ডেরা পর্যন্ত পেঁছানোর দেরি সয়নি। তার আগে মুরলিকে খেতে শুরু করেছে। চারজন অথবা পাঁচজন আলাদা করে মুরলিকে নিষ্পেষণ করেছে। দীর্ঘ সময় পায়নি কেউ। আগের জনকে সরিয়ে পরের জন মুরলিকে কেড়ে নিয়েছে। শার্টের বুক পকেটে চুড়ির টুকরো রেখে দিল অরিন্দম। ভেঙ্কট এখান দিয়ে গেলেও অন্ধকারে মুরলির ভাঙা চুড়ি দেখতে পায়নি। শিকারি

বেড়ালের মত কঙ্কর হাঁটছে। বাতাসের গন্ধ শুঁকছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কিছু শুনতে চাইছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কর্মীকে তার সঙ্গী করে ভুজবল পাঠিয়েছে। এতটা পথ একটা কথা না বলে, বন্দুক উঁচিয়ে ছায়ার মত তাকে আগলে রাখছে কঙ্কর। টর্চের আলোয় এক টুকরো রঙিন কাপড় অরিন্দম দেখতে পেল। সেটা রুমাল। হলুদ কাপড়ের ওপর খয়েরি সুতোয় তৈরি গোলাপফুল। কোমরের শাড়িতে গোঁজা, ভাঁজ করা এই রুমাল দিয়ে বেশ কয়েকবার মুরলিকে মুখ মুছতে দেখেছে অরিন্দম। মুখ কপাল মুছে রুমাল কোমরে গুঁজে রেখেছে। শক্ত করে পরা শাড়ির কোমর থেকে সেই রুমাল মাটিতে খসে গেল কীভাবে? টর্চের আলোয় প্রথমে ভাঙা চুড়ি, তারপর রুমাল পেয়ে অরিন্দমের ধারণা হল, মুরলি কাছে কোথাও আছে। মুরলিকে খুঁজে পেলে ভেংকটকেও হদিশ করা যাবে। উল্টোটাও হতে পারে। ভেংকটের হদিশ মিললে, মুরলিকে পাওয়া যাবে। হরণকারীরা কোথায়? মুরলিকে ধর্ষণের পরে খুন করা, তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। খুবই সম্ভব আর স্বাভাবিক। মৃত্যু যেখানে জলভাত হয়ে গেছে, সেখানে অপকর্মের পয়লা নম্বর সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখার কারণ নেই। দাগী অপরাধীরা রাখে না। খুন হওয়ার আগে মুরলি হয়ত মারা গেছে। বাঁ পাশে গাছপালা পাতলা হতে শুরু করেছে। জমিটা গড়ানে। টর্চের আলোতে দুটো টিলা দেখল অরিন্দম। টিলা দুটো চিনতে পারল। বিকেলে এই পথে কোউটি গিয়েছিল। একটা টিলা দেখিয়ে মুরলি বলেছিল, টিলাটার নাম গন্ধমাদন। সেটা ছিল অনেক বড় টিলা। এ দুটো টিলার আগে মাঝরাস্তায় গন্ধমাদনকে পেয়েছিল। গড়ানে জমি বাঁদিকে রেখে কিছুটা এগিয়ে খাদের ধারে পৌঁছে গেল অরিন্দম। খাদও চেনা। খাদের ভেতর থেকে জলস্রোতের আওয়াজ আসছে। ঢালু জমির জল খাদে পড়ছে। খাদের ভেতরে নেমে গেছে লতা-গুল্মের ঝোপ। লম্বা গাছগুলো একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে। টর্চ নেভাতে চাঁদের আলোয় জায়গাটা অলৌকিক ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। গাছের গুঁড়িগুলো লাইন দিয়ে মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে। ভেংকট নিশ্চয়ই এখান দিয়ে গেছে। উঁচু গলায়

মুরলির নাম ধরে ডাকাডাকি করেছে। মুরলি কি সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে? মুরলির কানে না পৌঁছলেও তার হরণকারীরা নিশ্চয় ভেঙ্কটের গলা শুনেছে। তারপর? টর্চের আলোয় খাদের গায়ে একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেল অরিন্দম! কোউটি যাওয়ার সময়ে সুড়ঙ্গটা দেখেনি। খাদের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন গিয়েছিল। সুড়ঙ্গ রয়েছে খাদের পূর্বদিকে। খাদের মধ্যে দুধাপ নামলে সুড়ঙ্গের মুখ। অরিন্দমের মনে হল, আলিবাবার গুহায় পৌঁছে গেছে সে। মুরলি এখানে আছে। ভেঙ্কটকেও পাওয়া যেতে পারে। সুড়ঙ্গটা কক্করও দেখেছে। সুড়ঙ্গের দিকে বন্দুক বাগিয়ে ভেতর পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। ফিসফিস করে কক্কর বলল, জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না। চলুন, গাড়ির রাস্তা ধরি।

সুড়ঙ্গের মুখে স্থির হয়ে আছে টর্চের আলো। মুখটা ছোট নয়। মাঝারি হাইটের একজন মানুষ মাথা নিচু না করে ভেতরে ঢুকতে পারে। ভেতরটা একবার দেখতে চায় অরিন্দম। টর্চ নিভিয়ে সে আকাশের দিকে তাকাল। লালচে ভাব কেটে গিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। চাঁদের আলো স্বচ্ছ হয়ে মাটিতে নেমে এসেছে। সুড়ঙ্গের মুখে, খাদের প্রতি খাঁজে আলো পড়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে কলকাতার জীবন, মনে হচ্ছে স্বপ্ন। বাড়িঘর, সংসার, কৌশিকী, দোদুল, এমনকি সংবাদপত্রের দপ্তর, স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। যত মৃত্যু, যত শিশুর জন্ম দেখেছে, সব সেই স্বপ্নের অংশ। ভয় কেটে গেছে। উদ্বেগ নেই। বিপন্ন দুজন মানুষকে ফেলে পালানোর অপরাধ বোধ কেটে গেছে। জাতুর পৌঁছনোর ব্যগ্রতা নেই। ক্লান্তি, খিদে, মৃত্যুভয়, স্বপ্নের মত রঙিন হয়ে উঠেছে। কক্কর বলল, চলিয়ে সাব।

কক্কর কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দিক থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল। প্রথমে দুটো আওয়াজ এবং তারপর একটানা দশ-এগারটা ফায়ারিং-এর পর চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বাতাসে কিছু মানুষের হাল্কা কণ্ঠস্বর। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে ভুজবল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বন্দুক উঁচিয়ে অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে কক্কর দাঁড়িয়ে আছে। অরিন্দম বলল, চলুন, সুড়ঙ্গের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দরকার হলে ভেতরে ঢুকে যাব।

কঙ্কর 'না' বলল না। গ্রামের রাস্তার দিকে তাকিয়ে পায়ে পায়ে পেছনে হাঁটতে থাকল। টর্চের আলো মাটিতে লুটিয়ে আছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে দূরের হৈচৈ। খাদের ধারে পৌঁছে কঙ্কর বলল, মনে হচ্ছে, ইনস্পেক্টরসাহেবের তাড়া খেয়ে বদমাশরা এদিকে আসছে। আপনি সুড়ঙ্গের ভেতরে চলে যান। বেশি ভেতরে যাবেন না। আমি থাকছি খাদের আড়ালে। কাউকে এদিকে ঘেঁষতে দেব না।

সুড়ঙ্গের দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়ে অরিন্দম দেখল, বন্দুক উঁচিয়ে খাদের সিঁড়িতে বুক পেতে কঙ্কর শুয়ে পড়েছে। রাস্তার দিকে তাক করা বন্দুকের নল। রাস্তা, আর দু'পাশের জলাজমি দিয়ে এদিকে কেউ আসতে পারবে না। গ্রামের হৈচৈ থেমে গেছে। চুপচাপ হয়ে গেছে চারপাশে। সুড়ঙ্গের কিছুটা ভেতর পর্যন্ত চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আলো মাড়িয়ে, নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে গেল অরিন্দম। বাইরে পাতলা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। সুড়ঙ্গের ভেতরেও অন্ধকার। খাদ, জলাজমি আড়ালে সরে গেছে। অরিন্দম দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল, ভেতরে মানুষ আছে। বন্ধ বাতাসে তামাকের গন্ধ পেল। শুধু তামাক কেন, মানুষের গায়ের গন্ধ পেল। নোনা ঘেমো এক ঝলক বাতাস ভেতর থেকে এসে নাকে লাগল। মানুষের গলার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনল অরিন্দম। ঘাবড়ে গিয়ে টর্চের বোতামে আঙুল ঠেকালেও আলো জ্বালল না। কান খাড়া করে কথা শোনার চেষ্টা করল। জড়ানো গলায় ভেংকট বলছে, মুরলি, আমি এসে গেছি। আর ভয় নেই। তুমি তাকাও। কথা বল। সাড়া দাও।

ফিসফিস করে যেন মুরলির কানে মুখ রেখে ভেংকট কথা বলছে। ভেংকট বলল, মুরলি ওঠ। ওরা ফিরে আসার আগে এখান থেকে পালাতে হবে। লাতুরে কেশবের কাছে যেতে হবে। সে অপেক্ষা করছে। সদাশিবও সেখানে আছে। সেই কথাটা মনে আছে? আমাদের একটা বাচ্চা চাই। কথা রাখব।

সুড়ঙ্গের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে অরিন্দম। কয়েক পা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। চাঁদের আলোর বেড় ক্রমশ বাড়ছে। আবছা

দেখা যাচ্ছে ভেঙ্কটকে। ভেঙ্কটের সঙ্গে ভেসে উঠছে মুরলির শরীর। ভেঙ্কটের চেয়ে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে মুরলিকে। মুরলির পাশে হাঁটু গেড়ে ভেঙ্কট বসে আছে। ফিকে আলো পড়েছে মুরলির শরীরে। তার বিবস্ত্র শরীর চকচক করছে। প্রাণের আভা ছড়াচ্ছে। মুরলিকে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে, তার নিরাবরণ দেহের দু'পাশে দু'হাত রেখে চাদরের মত ভেঙ্কট বিছিয়ে দিল নিজেকে। মুরলির নগ্নতাকে নিজের শরীর দিয়ে ঢাকতে চাইল। বেহাত হয়ে যাওয়া ট্রাউজার্স'টা সে পরে আছে। কোথা থেকে পেল এটা? প্যান্ট যারা খুলে নিয়েছিল, রাস্তায় নিশ্চয় তারা ফেলে গেছে। সুড়ঙ্গের মাটিতে আলোর তেজ বাড়ছে। ভেঙ্কট, মুরলিকে ভাল করে দেখার জন্যে কিছুটা এগিয়ে গেছে অরিন্দম। মুরলির মসৃণ গলায়, কাঁধে, লম্বা দু'বাহুতে ভেঙ্কট হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর বলে চলেছে হরেক কথা। সব অরিন্দম বুঝতে পারছে না। ভেঙ্কট বলছে, আমি জানি, তোমার ফুলের মত নরম শরীর ওরা পিষে ফেলেছে। আঁচড়, কামড়ে তোমার রক্ত বার করে দিয়েছে। ওই তো তোমার মুখে রক্ত, বুকে রক্ত। আর কোথায় কত রক্ত জমে আছে, দেখতে পাচ্ছি না। ভগবান, এ কী করলে?

ভ্রূ কুঁচকে মুরলির বুকে হাত রাখল ভেঙ্কট। নিটোল স্তনের মূল থেকে বৃন্ত পর্যন্ত তার হাতের পাতায় ঢাকা পড়ল। মাথা নামিয়ে এনে মুরলির বুকের ওপর কান পাতল ভেঙ্কট। বুকের শব্দ শুনে নাকের সামনে উল্টো করে ধরল হাতের পাতা। নিঃশ্বাসের তাপ লাগল হাতে। নিচু গলায় মুরলির নাম ধরে ডেকে বলল, আমি এসেছি। তাকাও, দেখ আমাকে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভেঙ্কট বলল, ঠিক আছে, তুমি ঘুমোও।

কথাটা বলে মুরলির ঠোঁটে ভেঙ্কট ঠোঁট ঠেকাল। তারপর কপাল, চিবুক, দু'গালে চুমু খেয়ে আবার ঠোঁটে এসে থামল। অরিন্দমের মনে হল, ভেঙ্কটের পরিচর্যায় মুরলির জ্ঞান ফিরে আসছে। শরীরের দু'পাশে ছড়ানো মুরলির দুটো হাত অল্প নড়ছে। চাঁদের ফিকে আলোয় দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে। মুরলির সাড়া পেয়ে ভেঙ্কট আড়ষ্ট

হয়ে গেল। ভয় পেল বোধহয়। পাথরের মেঝেতে অসহায়ের মত মুরলি পড়ে আছে। তার ঠোঁটে, গলায়, বুকে ভেংকট আবার চুমু খেল। আশপাশে ছড়ানো মুরলির শাড়ি, সায়া, ব্লাউজের কয়েকটা টুকরো তুলে নিয়ে, তার শরীর ঢাকতে চেষ্টা করল। পুষ্ট আখ ডাঁটার মত মুরলির শরীরকে টুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা সম্ভব নয়। মুরলির জংঘা, তলপেট, কোমর, বুক থেকে কাপড়ের টুকরোগুলো খসে যাচ্ছে। জায়গা বদল করে সেগুলো ঠিকমত রাখতে না পেরে ভেংকট অস্থির হয়ে উঠছে। প্রতিটা টুকরো চোখের সামনে ধরে কিছু দেখতে চাইছে। টুকরো কাপড়ের গন্ধ শুঁকছে। ভেংকটের হাবভাব দেখে অরিন্দম অবাক হল। মুরলির শরীরের ওপর থেকে এক এক করে টুকরোগুলো সরিয়ে জোরে শ্বাস টানল। আদিম কোনও গন্ধ বুকে টেনে নিয়ে মুরলির দু'পায়ে বাঁধা রুপোর তোড়ার দিকে তাকাল। শরীর, বসনহীন হলেও কারুকাজ করা তোড়া দুটো পায়ে রয়েছে। জ্বলজ্বল করছে রুপোর তোড়া। দু'হাতের মধ্যে অরিন্দম এসে গেছে, ভেংকটের খেয়াল নেই। ঘাড় সামান্য ঘোরালে অরিন্দমকে দেখতে পায়। ঘোরাচ্ছে না। পায়ে রুপোর তোড়া পরা মুরলির আদুল দেহের দিকে তাকিয়ে অল্প দুলছে তার শরীর। বাতাসে কামনার গন্ধ পাচ্ছে। মুরলিকে উল্টেপাল্টে একটু আগে যারা খেয়েছে, তাদের ঢেঁকুর তোলার শব্দ শুনছে। পঁচিশ বছর ধরে, যে মেয়েটার জন্য দেহে, মনে, মাঝে মাঝে ফুঁসে ওঠা কামনার আগুনকে চাপা দিয়ে শান্ত করেছে, আজ তাকে কত সহজে খেয়ে গেল চার-পাঁচজন অচেনা লোক। অথচ সে পায়নি। ঘনিষ্ঠ হয়েও শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি। মুরলি আপত্তি করত না। তার সব চাহিদা মিটিয়ে দিত। মুরলির মুখ-চোখে সে ইঙ্গিত অনেকবার পেয়েছে। সেই মেয়ে এখন নিশ্চুপ। মুরলির কানের কাছে মুখ নিয়ে ভেংকট চেঁচাল, মুরলি, সাড়া দাও। কেশবের মা, কেন চুপ করে আছ ? তুমি কথা না বললে আমি বিষ খাব। আত্মহত্যা করব।

মুরলি সাড়া দিল না। ফায়ারিংয়ের আওয়াজ এল। জোরালো আওয়াজ। কাছাকাছি গোলাগুলি চলছে। কিছু মানুষের অস্পষ্ট

কথা শুনতে পেল অরিন্দম। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে কঙ্কর বলল, সাবধান, বদমাশরা এদিকে আসছে। হয়ত সুড়ঙ্গে ঢুকবে। চেষ্টা করবে ওখানে লুকোতে। আপনি এদিকে চলে আসুন।

অরিন্দম থতমত খেল। কঙ্করের কথা ভেংকট শুনতে পেল না।

সে আবার বলল, কথা বলো। কেশব অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। তুমি কথা না বললে সে অভিমান করবে, কাঁদবে। মা হয়ে তাকে তুমি কাঁদাতে পারো না। তুমি কথা না বললে সে-ও কথা বলবে না। বাড়ি ফিরতে চাইবে না। তখন কি করবে তুমি? কথা না বলে পারবে না। তাহলে আমার সঙ্গে কেন কথা বলছো না?

মুরলির কপালে মুখ গুঁজে ভেংকট বলে চলেছে, আমি মরব। মরা ছাড়া আমার উপায় নেই। ভূমিকম্পে সরসী আর বাচ্চাটা মারা গেছে। কত আত্মীয় মাটি চাপা পড়েছে! কার জন্যে আমি বাঁচব?

অরিন্দম দেখল, বিলাপের মধ্যে ভেংকটের শরীরে ঢেউ ভাঙছে। শুধু ভেংকট নয়, সমান তালে সাড়া দিচ্ছে মুরলি। তার তলপেট থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাঁপছে। চাঁদের আলোয় শ্যামবর্ণ ত্বক সোনালি দেখাচ্ছে। আদর মাখা গলায় ভেংকট বলছে, আমি জানতাম, তুমি সাড়া দেবে। আমার ডাকে চুপ করে থাকতে পারবে না। আমার কাছে পাওনা বাচ্চাটা, হয়ত আজ রাতে তোমার পেটে পৌঁছে যাবে। আমার বাচ্চার মা হবে তুমি।

গলা নামিয়ে, বাতাসের মত ফিসফিস করে ভেংকট বলল, কথাটা এখন তোমাকে বলা যায়। আমার মত, পৃথিবীতে তোমারও কেউ নেই। ভুল বললাম। একটা একরত্তি মেয়ে আছে তোমার। কিন্তু স্বামী সদাশিব, ছেলে কেশব, নেই। পৃথিবী ছেড়ে তারা চলে গেছে। তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে মাটি চাপা পড়েছে তোমার দিদি, পার্বতী।

কথা শেষ হওয়ার আগে 'বাঁচাও' বলে ভয়ে লাফিয়ে উঠল ভেংকট। চমকে সরে গেল অরিন্দম। ভেংকটের গলার স্বর সুড়ঙ্গের বাইরে পৌঁছনোর পরের মুহূর্তে ফায়ারিংএর আওয়াজ শুনল সে। এক-

ঝলক আলো দেখল। কক্কর বন্দুককে চালাচ্ছে। সুড়ঙ্গে যাদের ডেরা, তারা কাছাকাছি এসে গেছে। সুড়ঙ্গের বাইরে, কক্করের কাছে এখনই চলে যাওয়া উচিত। কক্কর একা কি একদল খুনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে? তাকে বাঁচাতে পরেবে? কক্করের সঙ্গে সে মরতে রাজি নয়। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে খাদের অন্য কোথাও গা ঢাকা দিতে পারে। তারপর? দিনের আলোয় এই মৃত্যুউপত্যকা ছেড়ে কি কিলারি ফিরতে পারবে? একতরফা তিনটে গুলি চালিয়ে, উল্টোদিকে জবাব না পেয়ে কক্কর থেমে গেছে। মুরলিকে ছেড়ে ভেংকট ভয়ে কেন লাফিয়ে উঠল, অরিন্দম বুঝল না। মুরলি কি কোনওভাবে ব্যথা দিয়েছে ভেংকটকে? মুরলির পাশে ভেংকট আবার হাঁটু গেড়ে বসেছে। মুরলির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। কান্নার মধ্যে পাগলের মত আদর করতে লাগল মুরলিকে। তাকে চুমু খেয়ে, সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে, তার লম্বা কালো চুলের ঢল দু'ভাগ করে, দু'গোছা চুলে দুটো স্তন ঢেকে দিয়ে বলল, কথা বল মুরলি। চুপ করে থেক না। বিশ্বাস কর আমাকে। আমি তোমাকে ভালবাসি।

ভেংকটের শরীর প্রবল ঢেউ ভাঙছে। শরীরের এই অভিব্যক্তি অরিন্দমের অচেনা নয়। কামনায় ভেংকট পাগল হয়ে গেছে। উলঙ্গ মুরলিকে পিষছে। তার মুখে আলগা হাসি। ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ভেংকট বলল, আমি বুঝতে পারছি, তোমার জ্ঞান ফিরেছে। এই তো, হাসি ফুটেছে মুখে।

চাঁদের আলোয় একটু আগে ভেংকটের মুখে অরিন্দম হাসি দেখলেও মুরলির ঠোঁট একভাবে জুড়ে আছে। শরীরে নড়াচড়া নেই। মুরলির উদাসীনতাকে ভেংকট ভাবল, খেলা। আরও আদর চায় মুরলি। উত্তেজিত হল সে। মুরলির দুটো অনাবৃত কাঁধ শক্ত করে ধরে বলল, কালই তোমাকে বিয়ে করব। কথা দিচ্ছি। তোমার গর্ভে আজ যে আসছে, তাকে নিয়ে কারও অকথা, কুকথা বলার সুযোগ থাকবে না। সে হবে আমাদের বৈধ বাচ্চা। ওহ্, কী আরাম! ভগবান আছেন। এত দুঃখেও আমাদের ছেড়ে যাননি।

সোহাগে বিগলিত মুরলির গলার অস্ফুট আওয়াজ শুনল অরিন্দম। দু'হাতে ভেঙ্কটের কোমর, মুরলি জড়িয়ে ধরছে। প্রায় বৃত্তাকার হয়েছে চাঁদের আলো। বৃত্তের মধ্যে নারীপুরুষের যুগলবন্দি থেকে অরিন্দম চোখ সরাতে পারছে না। হাতে স্টিলের পাঁচ ব্যাটারি টর্চ। বোতাম টিপলে আলোয় সুড়ঙ্গ ভেসে যাবে। অরিন্দম আঙুলে বোতাম ছুঁতে খাদের ধারে কক্কর চেঁচিয়ে উঠল, হল্ট।

অরিন্দম চমকে গেল। সুড়ঙ্গের মুখে বন্দুকের আওয়াজ শুনল। আওয়াজ একতরফা নয়। গুলি লেনদেন হচ্ছে। রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা জিপ। খাদের ধার দিয়ে কয়েকজন দৌড়ে চলে গেল। অন্ধকারে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগে ফায়ারিং হল। যন্ত্রণায় ক'কিয়ে উঠে মাটিতে কেউ পড়ে গেল। তীক্ষ্ন স্বরে হুইসিল বাজছে। খণ্ডযুদ্ধের হৈচে ভেঙ্কট শুনতে পাচ্ছে না। মুরলির কানে কোন আওয়াজ ঢুকছে না। দুজনে বোধহয় কালা হয়ে গেছে। থেমে থেমে বেজে যাচ্ছে হুইসিল। ভুজবলের জিপের শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

দশ

আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই

(জীবনানন্দ দাশ)

টর্চের বোতাম টিপতে গিয়ে অরিন্দম থেমে গিয়েছিল। সুড়ঙ্গের মুখে কয়েক জোড়া ভারি পায়ের আওয়াজ থেমে যাওয়ার পরেও টর্চ জ্বালল না। টর্চের কথা সে ভুলে গেছে। ছায়াছবি চলছে চোখের সামনে। ছবির মানুষ দু'জনকে ছোঁয়া যায়। ইচ্ছে করলে তৃতীয় চরিত্র হতে পারে সে। যুগলবন্দির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। কথাটা মনে হতে অরিন্দম পাথর হয়ে গেল। পনেরদিন আগে এখানে পৃথিবী ভেঙে পড়েছে, ত্রিশ হাজার মানুষ মারা গেছে,

খেয়াল নেই। কৌশিকী, দোদুল, মন থেকে মুছে গেছে। ভুজবল ডাকল, মিস্টার অরিন্দম দত্ত?

ভুজবলের ডাক অরিন্দমের কানে ঢুকল না। ভুজবল আবার ডাকল, পত্রকারসাব?

অরিন্দম চুপ। ভুজবল বলল, টর্চ জ্বালুন।

অরিন্দম টর্চের বোতাম টিপতে গেলে সেটা হাত থেকে পড়ে গেল। মেঝেতে টর্চ পড়ার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা টর্চ জ্বলে উঠল। টর্চের আলো মুখে লাগতে অরিন্দম সম্বিৎ পেল। তার হাত আড়ষ্ট হয়ে গেছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছে না। অরিন্দমকে দেখে সদলে ভেতরে ঢুকল ভুজবল। মেঝে থেকে বাঁ হাতে টর্চটা তুলে নিল। ডান হাতের রিভলভার পকেটে রেখে অরিন্দমের পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, কোনও অসুবিধে নেই তো?

অরিন্দম কিছু বলার আগে তার মুখ ছেড়ে টর্চের আলো ভেঙ্কটের পিঠে পড়ল। ভেঙ্কটের কাঁধের পাশে দেখা গেল মুরলির মুখ। দু'চোখ বুজে আছে। শুকনো ঠোঁট। এলো চুল বুকের দু'পাশে ছড়ানো। টর্চ হাতে সিপাই বিড়বিড় করল, ইন্সাল্লাহ।

ভেঙ্কটের জামার কলার বাঁ হাতে ধরে মুরলির ওপর থেকে তাকে টেনে তুলল বন্দুকধারী এক সিপাই। এক ঝলক আলো মুরলির নগ্ন শরীর ছুঁয়ে জ্বলে উঠে তখনই নিভে গেল। অন্ধকার সুড়ঙ্গ। চাঁদের আলো লুটিয়ে আছে সুড়ঙ্গের মুখে। আকাশ দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে জলের কলকল আওয়াজ। ভেঙ্কট এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে বাইরের দিকে দৌড় লাগাল। সুড়ঙ্গের মুখে বন্দুক নিয়ে কক্কর পাহারায় ছিল। ভেঙ্কটকে সে আটকে দিল। ভেঙ্কট গায়ের জোর ফলাতে গিয়ে কক্করের কনুইএর গুঁতো খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ভেঙ্কটের দিকে ভুজবলের নজর ছিল না। টর্চ জ্বেলে সে দেখছিল মুরলিকে। কয়েক সেকেন্ড দেখে মুরলির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসল। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল মুরলির দিকে। তার হাতের আলো মুরলির কপাল, মুখ, গলা, বুক, নাভি, জঙ্ঘা ছুঁয়ে ওঠানামা করছে। মুরলির বুকের বাঁদিকে

আলতো করে হাত রেখে তার হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করে টর্চ নিভিয়ে দিল ভুজবল। অন্ধকার সুড়ঙ্গ। চাঁদের আলো সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে সরে গেছে। অন্ধকারে নিজের হাত-পা পর্যন্ত অরিন্দম দেখতে পাচ্ছে না। ভুজবল আবার যখন টর্চ জ্বালল, মুরলির পাশ থেকে তখন সে সরে এসেছে। মেঝেতে পড়ে থাকা মুরলির শাড়ির সবচেয়ে বড় টুকরোটা তুলে নিয়ে দুজন সিপাইকে ভুজবল নিচু গলায় কিছু বলল। শাড়ির টুকরোটা টানটান করে মেলে মুরলির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিল দুই সিপাই। মুরলির মুখে কাপড় চাপা পড়তে অরিন্দম থতমত খেল। মুরলি বেঁচে নেই। সে যা ভয় পেয়েছিল, তা-ই ঘটে গেছে। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ভেঙ্কট চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে ছেড়ে দাও। মুরলির সঙ্গে আমার কথা আছে। লাতুরে পেঁছে দিতে হবে তাকে।

মুরলির আচ্ছাদনের দুপ্রান্তে পাথরের দুটো ভারি চাঁই রেখে, কাপড় যাতে সরে না যায়, ভুজবল সেই ব্যবস্থা করল। অরিন্দমের পাশে এসে বলল, এক-দেড় ঘণ্টা আগে মেয়েটা মরে গেছে।

অরিন্দমের কানে তালা লেগে গেল। ভুজবল বলল, খুনেদের দুজনকে ধরে ঘরে আটকে রেখেছি। তাড়াতাড়ি হাজতে চালান করতে হবে। লাশটাও সরানো দরকার।

অরিন্দমের মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেছে। মুরলি মারা গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না। যে মেয়ে, দুপুরে গাড়িতে পাশে বসেছিল, তারপর থেকে ছায়ার মত সঙ্গে রয়েছে, রাত দশটায় কীভাবে মেনে নেওয়া যায়, সে নেই? ভুজবল বলল, হার্ডকোর ক্রিমিনালরা ধর্ষিতাকে বাঁচিয়ে রাখে না। খুন করে। সবচেয়ে সহজ হলো, গলা টিপে মেরে দেওয়া। কিন্তু সেখানে বিপদ আছে। মৃতের গলায় হাতের ছাপ থেকে যায়, জেনে গলা টিপে মারেনি। মুরলির গলায় ফাঁস বেঁধে তাকে খুন করেছে। ফাঁসের দাগ রয়েছে গলায়।

এক সেকেন্ড থেমে ভুজবল বলল, ফাঁসি দেওয়ার আগে হয়ত মেয়েটা মরে গিয়েছিল। উত্তেজনার চোটে খুনেরা টের পায়নি। পোস্টমর্টেম করলে সব ধরা পড়বে।

ভুজবলের কথা অরিন্দমের কানে যাচ্ছে না। দু'জন বন্দুকধারীকে পাহারায় রেখে অরিন্দমকে ভুজবল বলল, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমাকে আবার এখানে ফিরতে হবে। জায়গাটা খারাপ। আরও ফোর্স চাই।

কঙ্করের হাত ছাড়িয়ে মুরলির কাছে আসার জন্যে ভেঙ্কট ছটফট করছে। মুরলির সঙ্গে তার যে ভীষণ দরকার, একনাগাড়ে বলে চলেছে। তার সব কথা না বুঝলেও, মাথাটা যে বিগড়েছে, অরিন্দম বুঝতে পারছে। মাথা স্বাভাবিক থাকলে মৃত মুরলিকে জড়িয়ে এতক্ষণ কাটাত না। মুরলি মারা গেছে, মুহূর্তের জন্যে বুঝতে পারেনি। সত্যি কি তাই? মুরলিকে আদর করার মধ্যে ভেঙ্কট একবার ভয়ে লাফিয়ে উঠেছিল। কেন ভয় পেল ভেঙ্কট? হঠাৎ কি অনুভব করেছিল মুরলির শরীরে প্রাণ নেই? হতে পারে। ভেঙ্কটের মনের স্বাভাবিকতা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ফিরে এসেছিল। বেশি সময় থাকেনি। মৃত মুরলিকে জীবিত ভেবে আবার আঁকড়ে ধরেছিল। শুধু ভেঙ্কট কেন, তার দেখাতেও বিভ্রম ছিল। মুরলিকে সে নড়াচড়া করতে দেখেছে। ভেঙ্কটের সোহাগে সাড়া দিয়ে কাঁপন জেগেছিল মুরলির শরীরে। এক-দেড়ঘণ্টা আগে মুরলি মারা গেলে, এটা সম্ভব নয়। ভুল দেখেছিল সে। একজন মৃত, আর এক উন্মাদকে নিয়ে নিজের তৈরি ছায়াছবি দেখে সে রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। ভুজবল একটু দেরিতে এলে সে নিজেও ছায়াছবির চরিত্র বনে যেত। ত্রিশ হাজার মৃত্যুর খবর করতে এসে হারিয়ে ফেলত জীবন-মৃত্যুর ফারাক।

ভুজবলের সঙ্গে সুড়ঙ্গের বাইরে এসে দাঁড়াল অরিন্দম। ভেঙ্কটকে নিয়ে কঙ্কর এগিয়ে গেছে। ভেঙ্কটের ঘাড়ের ওপর কঙ্করের হাত। ঈষৎ কুঁজো হয়ে ভেঙ্কট হাঁটছে। সুড়ঙ্গের মুখে ছড়িয়ে আছে চাঁদের আলো। ভুজবল বলল, খুনে বদমাশরা দলে দলে ফাঁকা গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়েছে। কিলারি থেকে ফোর্স নিয়ে চটপট না ফিরলে, সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। আটক দুই খুনেকেও ঘরের তালা ভেঙে তারা নিয়ে যেতে পারে।

ভুজবলের গলা শুনে বোঝা যায়, সে দোটানায় আছে। ফাঁকা

মাঠের মধ্যে তিন সিপাইকে রেখে যেতে অস্বস্তি বোধ করছে। খাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে চারজন। মাঝে মাঝে ভেংকট দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কক্করের ঠেলা খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। মিনিট দশ হাঁটলে রাস্তায় জিপের কাছে পেঁছে যাবে। মৃত মুরলিকে নিজের চোখে দেখেও সে মারা গেছে, অরিন্দম বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, ভুজবল ভুল করছে। টর্চের আলোয় বেহুঁশ মুরলিকে দেখে মৃত ভেবে নিয়েছে। মানুষ এত সহজে মরে না। চার-পাঁচজন লোকের বলাৎকারে মুরলি জ্ঞান হারিয়েছে। মুরলিকে এখনই একজন ডাক্তার দেখানো দরকার। ঠিকমত ওষুধ পড়লে মুরলির জ্ঞান ফিরে আসবে। যেসব লক্ষণ দেখে তাকে ভুজবল মৃত ভেবেছে, তা যে কখনও-সখনও মুমূর্ষু অবস্থাতেও ঘটে, ভুজবল জানতে পারবে। মুরলিকে ডাক্তার দেখানোর কথা অরিন্দম বলতে ভুজবল দাঁড়িয়ে গেল। অরিন্দমের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, সতের বছর পুলিসে চাকরি করছি। জ্যান্ত মানুষ, আর মুর্দা, চিনতে ভুল করি না। মেয়েটা মরে গেছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীর। চলুন, তার শরীরে হাত রেখে আপনি দেখে আসবেন।

ভুজবলের প্রস্তাব শুনে অরিন্দম থিতিয়ে গেল। ভুজবল জিজ্ঞেস করল, যাবেন ?

কথা না বলে অরিন্দম হাঁটতে শুরু করল। চাঁদের আলোয় ভুজবলের ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি তার নজর এড়াল না। অরিন্দমের পাশাপাশি হাঁটছে ভুজবল। কিছুটা এগিয়ে কক্কর চলেছে ভেংকটকে নিয়ে। ভেংকটের ঘাড়ের ওপর থেকে সরে গেছে কক্করের হাত। তার থাবা থেকে ভেংকট ছাড়া পেয়েছে। খাদের ধার ঘেঁষে হাঁটছে ভেংকট। ভেংকটের চলন দেখে অরিন্দমের গা ছমছম করছে। জায়গা বদল করে ভেংকটকে ডান পাশে রেখে, খাদের ধার দিয়ে কক্করের হাঁটা উচিত। ভুজবল তাই করেছে। খাদের দিকে অরিন্দমকে রাখেনি। ঘটনাটা ভুজবলের নজরে আনার মুহূর্তে ভেংকটকে দেখিয়ে সে বলল, লোকটা পাগল হয়ে গেছে। পাগল না হলে একটা মরা মানুষকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারত না। ভয়ে পালিয়ে আসত।

ভয় পেয়ে ভেংকট যে একবার সরে এসেছিল, ভুজবলকে অরিন্দম বলল না। ভুজবলের কথা সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। অভিজ্ঞ পুলিসের চোখ দিয়ে মুরলিকে পরীক্ষা করেছে ভুজবল। হয়ত ভুল দেখেনি। সে ভুল করেছিল। মৃত মুরলিকে জীবিত ভেবেছিল। আদিম মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কুয়াশার মত হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে মাঠে। গুলি চালাচালির পরে চারপাশ নিস্তব্ধ। ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে। অন্ধকার হঠাৎ নড়ে উঠল। কক্করকে পেছনে ফেলে খাদের ধাপ দিয়ে অন্ধের মত ভেংকট ছুটছে। থতমত খেয়ে গেলেও তাকে ধরতে কক্কর বন্দুক বাগিয়ে তাড়া করেছে। ক্রমশ খাদের নিচে নেমে যাচ্ছে ভেংকট। ভুজবল টর্চের আলো ফেলল ভেংকটের শরীরে। সুড়ঙ্গের দিকে বিপজ্জনকভাবে ভেংকট দৌড়লেও কখনও সেখানে পেঁছিবে না। খাদের তলার দিকে নেমে যাবে। দরকারি কথাগুলো মুরলিকে বলার আগে পা পিছলে খাদের দেড়-দুশ ফুট নিচে পেঁছে যাবে। হাড়গোড় ছাতু হয়ে যাবে। টুঁ শব্দ করার সুযোগ পাবে না। শরীর নেতিয়ে পড়বে। কেউ তার খোঁজ করবে না। ত্রিশ হাজার মানুষ যেখানে মারা গেছে, সেখানে একজন উন্মাদের লাশ খুঁজতে কে আসবে?

ভুজবল হাঁকল, কক্কর, ওকে যেতে দাও।

কক্কর দাঁড়িয়ে গেলেও ভেংকট দৌড় থামাল না। খাদের বাঁকে সে মিলিয়ে গেল। আলো নিভিয়ে ভুজবল বলল, লোকটা খরচের খাতায় চলে গেল।

অরিন্দমের কথা বলার শক্তি নেই। কী বলবে সে? খাদের ধাপ ধরে দৌড় দিয়ে ভেংকট কখনও মুরলির কাছে পেঁছিল কিনা, সে জানতে পারবে না। ইচ্ছে থাকলে জানা যায়। কাল-পরশু কিলারি ছুঁয়ে সে ওসমানবাদ জেলায় ঢুকবে। কিলারিতে নেমে ভুজবলের সঙ্গে দেখা করা যায়। লাতুর থেকে ভুজবলকে কাল ফোন করে বাকি ঘটনা শুনে নিতে পারে। কিন্তু কী লাভ? মুরলির মৃত্যু তাকে বিমর্ষ করেছে। ভেংকটের জন্যেও বিষাদে মন ভরে উঠছে। সংবাদপত্রে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর পড়ার

চেয়ে একজন পরিচিত মানুষকে চোখের সামনে মরতে দেখার ঘটনা, বেশি কষ্ট দেয়, বুঝতে পারছে। পায়ের নিচে মাটি কেঁপে না উঠলে, পৃথিবী ঘুরছে, মানুষ টের পায় না। ত্রিশ হাজার মৃত্যুর চেয়ে মুরলির মৃত্যু বেশি ভারি লাগছে। অরিন্দম অনুভব করল, পৃথিবী শুধু ঘুরছে না, পৃথিবী কাঁপছে। লাতুর, ওসমানাবাদ থেকে কলকাতা অবিশ্রান্ত কেঁপে চলেছে। পা টলছে, ঝিমঝিম করছে মাথা, অরিন্দম তবু হেঁটে চলল। ভুজবল শুনিয়ে চলেছে, জীবনের নানা হেঁয়ালির ঘটনা। ঘটনাগুলো আপাতদৃষ্টিতে নিয়মহীন, অথচ কোথাও একটা নিয়ম আছে। নিয়মহীন নিয়মের একটা ঘটনা সদ্য ঘটে গেল। মুরলি, ভেঙ্কটকে বাঁচাতে লাতুর না গিয়ে জঙ্গলে ঢুকল অরিন্দম। খুঁজে পেল দুজনকে, অথচ বাঁচাতে পারল না। সে পৌঁছনোর আগে একজন মারা গিয়েছিল, আর একজন, তার চোখের সামনে খাদে লাফ দিয়ে আত্মঘাতী হল। জীবন এরকম। ডাকাতের খপ্পরে পড়া তিনজনের একজন অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। চেষ্টা করেও সঙ্গী দুজনকে সে বাঁচাতে পারে না। দুজনের মৃত্যুর ধরনও আলাদা। ডাকাতের হাতে একজন খুন হয়। ডাকাতদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে অন্যজন অকারণে আত্মহত্যা করে।

ভুজবলের সব কথা অরিন্দম শুনছে না। কানে যা যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না। ভুজবল বোধহয় নিয়তিতে বিশ্বাস করে। ভুজবল বলল, ত্রিশ হাজার লোক যে একরাতে মারা গেল. সে-ও তো একটা অনিয়ম। প্রকৃতির খামখেয়াল। কোনও জ্যোতিষী বলবে না, ত্রিশ হাজার লোকের একসঙ্গে মৃত্যুযোগ ছিল। হাতের পাতায় হয়তো লম্বা আয়ুরেখা ছিল অনেকের! তবু তারা বাঁচল না। অথচ বাহাত্তর ঘণ্টা মাটি চাপা পড়ে থেকেও দেউঁড়ি গ্রামের সেই বাচ্চাটা বেঁচে গেল। ট্যাঁ-ট্যাঁ করে সে কাঁদতে শুরু করেছে। ভেবে দেখুন, কত বড় হেঁয়ালি।

জিপ চলেছে টপ গিয়ারে। শিখ জিপ চালক জানে চার সহকর্মী এখানে থেকে গেল, ফেরার তাড়া আছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় জিপ লাফাচ্ছে। বন্দুক বাগিয়ে জিপের পেছনে বসেছে কক্কর। হেড-

লাইটের আলোয় অনেক দূরে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাঝ আকাশে স্থির হয়ে আছে চতুর্থীর চাঁদ। ভুজবল বলল, আপনার লাতুর পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে।

এগারো

সনম কসম লে লে মুঝ সে তো আপনে পেয়ারকি

(ইলা অরুণের গান)

লাতুর পৌঁছনোর দশ মিনিট পরে, কলকাতায় কৌশিকীকে অরিন্দম যখন ফোন করল, তখন রাত সাড়ে তিনটে। জেগে বসেছিল কৌশিকী। ফোন একবার বাজতে রিসিভার তুলল। জিজ্ঞেস করল, এত দেরি?

কৌশিকীর গলার স্বরে উদ্বেগের আভাস না পেয়ে অরিন্দম খুশি হল। দেরিতে ফোন করার জন্যে কৌশিকী ঘাবড়ে যায়নি। তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক। সহজভাবে কথা বলছে সে। অরিন্দম বলল, রাস্তায় আটকে গিয়েছিলাম।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কৌশিকীকে বুঝতে দিল না। জিজ্ঞেস করল, দোদুল ঘুমিয়েছে?

রাত দেড়টা পর্যন্ত জেগে থাকার পরে আর পারল না।

আর সেই দুষ্টুটা? কী করছে সে?

সে হাত-পা ছুঁড়ছে।

কোনও অসুবিধে নেই তো?

আছে।

কী?

ভীষণ একা।

ফোন নম্বরটা লিখে নাও। কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত এখানে আছি। তারপর অন্য জায়গায় যাব। সেখান থেকে কাল সন্ধেতে ফের ফোন করব। ফোনে তুমি তলব পাঠালে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে

কলকাতা পেঁৗছে যাব।

ঠিক তো ?

ঠিক।

ডেকান হোটেলের ফোন নম্বর কৌশিকীকে জানিয়ে, বিছানায় শুয়ে অরিন্দম চোখ বুজল। অন্ধকার ঘর। ভুজবলের হেঁয়ালি তত্ত্বটা মাথার ভেতরে ঝমঝম করছে। ত্রিশ হাজার সুস্থ, সবল মানুষ, এক রাতে, বিনা নোটিসে মারা গেলে জীবনটা হেঁয়ালি মনে হতে পারে। পরিব্যাপ্ত সেই মৃত্যুর মধ্যে ঘটনাচক্রে দু-একজন বেঁচে গেলে সেটাও হেঁয়ালি ছাড়া কিছু নয়। মুরলির মৃত্যু, অন্ধকার খাদের বাঁকে ভেঙ্কটের মিলিয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত হেঁয়ালি। ভেঙ্কট, মুরলির সঙ্গী হয়ে সে যে প্রাণ নিয়ে ফিরে এল, তার ব্যাখ্যা কী ? মানুষ এত হেঁয়ালি নিয়ে কী করে বেঁচে আছে ? কৌশিকীর সঙ্গে কথা বলে অরিন্দমের এখন নিজেকে হালকা লাগছে। ঘুমে বুজে আসছে দু'চোখ। ঘুমোলেই অদৃশ্য ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। লাল পাথর লাগানো সোনার নাকছাবি পরা মুরলির শ্যামলা গোল মুখ, চোখের সামনে ভেসে উঠছে বারবার। গোপন অনুশোচনা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কোউটি থেকে ফেরার পথে, অন্ধকারে তার মুখ দেখা না গেলেও তার মতলব মুরলি টের পেয়েছিল। হাতের ছোঁয়াতে ধরা পড়েছিল তার অভিসন্ধি। গাড়িতে মুরলিকে একা তুলে নিয়ে লাতুরে চলে আসতে চেয়েছিল সে। মুরলি হয়ত সেই মুহূর্তে মৃত্যুকে দেখেছিল। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে অরিন্দম অনুভব করল, অজান্তে সে-ও মৃত্যুকে স্পর্শ করেছিল। বিছানায় মৃত্যুকে পাশে নিয়ে এখন শুয়ে আছে। ধড়ফড় করে জেগে উঠল অরিন্দম। কিলারি থেকে গাড়িতে লাতুর আসার পথে মনে হয়েছে, গাড়িতে সে একা নয়, আরও কেউ আছে। শরীরহীন সেই উপস্থিতি, সারা পথ টের পেয়েছে। রাত দুটোয় নির্জন ৯-নম্বর জাতীয় সড়কে একশ গজ অন্তর লাইটপোস্টের সবগুলোতে আলো জ্বলছিল না। হঠাৎ করে অন্ধকার ঘন হচ্ছিল। ফ্যাকাসে আলোয় দেড় ঘণ্টার পথ মনে হচ্ছিল অন্তহীন। সেই পথে অনন্তকাল ধরে তার গাড়ি চলেছে। রাস্তা শেষ হবে না। ডেকান হোটেলের সদর দরজায় দাঁড়িয়েও সেই ঘোর কাটেনি।

তিনটে বড় তালা লাগানো হোটেলের কোলাপসিবল গেটের ভেতরে লম্বা করিডরটাকে জাতীয় সড়কের অংশ মনে হচ্ছিল। টিমটিমে আলো জ্বলছিল করিডরে। করিডরের মাঝখানে ফাঁকা রিসেপশন কাউন্টার। তিনতলা হোটেলে জনপ্রাণীর সাড়া নেই। অরিন্দম কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করল। কোলাপসিবল গেট ধরে মজিদ কয়েকবার ঝাঁকুনি দিতে নোটবুক, কলম হাতে দোতলা থেকে একজন নেমে এসে বলল, আমার নাম, শ্রীনাথ ট্যান্ডন, আমি এখানকার ম্যানেজার।

অরিন্দম পরিচয় দিতে জিভ কেটে শ্রীনাথ বলল, আপনার জন্যে জেগে থেকেও আপনার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কবিতা লিখছিলাম। নেশা আর কি!

হোটেলে ঢুকে অরিন্দম জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের দারোয়ান নেই?

আছে। দারোয়ান আছে চারজন। বত্রিশ জন চাকরি করে এখানে। দু-তিনজন ছাড়া রাতে হোটেলের ভেতরে কেউ থাকে না। এগারটা বাজলে বিছানা আর ছাতা নিয়ে মাঠে চলে যায়। সেখানে ঘুমোয়। বৃষ্টি নামলে বিছানা গুটিয়ে আকাশের তলায় ছাতা খুলে বসে থাকে। এখানকার বেশিরভাগ গৃহস্থ তাই করছে। ভূমিকম্পের ভয়ে রাতে বাড়িতে থাকছে না। মাঠে শুয়ে ঘুমের মধ্যে ভূমিকম্পের স্বপ্ন দেখে, সত্যি ভূমিকম্প ভেবে চমকে উঠছে। সকালে রটিয়ে দিচ্ছে রাতে ভূমিকম্প হয়েছিল। সবাই জানে গুজব। তবু সকলে বিশ্বাস করে।

অরিন্দম কথা বাড়ায়নি। কবি হোটেলম্যানেজারকে বলে মজিদের শোওয়ার ব্যবস্থা করে ঘরে চলে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘর। আবছা তন্দ্রার মধ্যে বিছানাটা হঠাৎ দুলে উঠতে অরিন্দমের ঘুম ছুটে গেল। মনে হল, হোটেলের তিনতলা ইমারতটা দুলছে। তাসের ঘরের মত এখনই চুরচুর করে ভেঙে পড়বে। বিছানায় উঠে বসল অরিন্দম। জল খেল। শরীর সুস্থির হতে বুঝল ভূমিকম্প হচ্ছে না। অকারণে ভয় পেয়েছে। ঘামে শরীর ভিজে উঠেছে। ভিজে তোয়ালেতে গা মুছে শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। হাতঘড়িতে দেখল

সাড়ে আটটা। বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে রোদ ঢুকেছে। বিছানা থেকে উঠে জানলা খুলে দিল অরিন্দম। হেমন্তের ঝকঝকে নীল আকাশ। মেঘ নেই। ফুরফুরে বাতাস লাগল শরীরে। স্নান সেরে আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিল। পোশাক বদলের সময়ে পাটভাঙা শার্টের বুক পকেটে মুরলির ভাঙা চুড়ির টুকরোটা রাখল। কাল রাতে জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া এই টুকরোটার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। ছেড়ে রাখা জামা ভাঁজ করে সুটকেসে তুলতে গিয়ে সেটা হাতে ঠেকল। ভূমিকম্পের স্মরনিকা! কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কৌশিকীকে দেখাবে। ছিটেফোঁটা ক্লান্তি নেই শরীরে। গত রাতের উদ্বেগ হালকা মেঘের মত মাথা থেকে উড়ে গেছে। ভুজবলের মত জীবনকে হেঁয়ালি মনে হচ্ছে না। সারাদিনের কাজের ছক সে ভেবে নিল। লাতুর জেলার তিনটে তালুকের ছ'টা গ্রাম দেখে সন্ধের পর ওসমানাবাদ জেলায় চলে যাবে। সদর শহরের একটা হোটেলে রাতে থাকবে। কাল সারাদিন ঘুরবে ওসমানাবাদের কিছু গ্রামে। ব্রেকফাস্ট সেরে এখান থেকে লাতুরের নীলনাগ তালুকের দিকে রওনা হবে। ৯-নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময়ে ভুজবলের দপ্তরে একবার উঁকি দেওয়ার কথা আছে। ভুজবলের সঙ্গে কাল রাতে কথা হয়েছিল। বেহাত ক্যামেরা, মানিব্যাগ পেয়ে যেতে পারে। জাতীয় সড়কের ওপরে সার্কেল ইনস্পেক্টর, ভুজবল মালব্যের অফিস। অফিস চত্বরে বাসস্থান। দপ্তরে যেতে না পারলে ভুজবলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবে। ফোন নম্বর লিখে রেখেছে। ডেকান হোটেলের খাওয়ার ঘরে, মজিদকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে, কাজের ছক যতটা সম্ভব, তাকে জানিয়ে দিল অরিন্দম। কলকাতা পাঠানোর জন্যে প্রথম প্রতিবেদনটা লিখে ফেলল। শিরোনাম দিল 'গণচিতার পাশে শিশুর হাসি'। দেউড়ি গ্রামের মাটি চাপা পড়া বাচ্চাটার খবর। মাটির নিচে বাহাত্তর ঘণ্টা থাকার পরেও সে বেঁচে আছে। হাসছে। ভুজবল কাল খবরটা দিয়েছিল। সেই দেউড়ি থেকে আজ শুরু করবে সফর। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় দুটো জেলার, সাতটা তালুকের এগারটা গ্রাম ঘুরবে। সফরসূচি সেভাবে সাজিয়েছে।

টেলিপ্রিন্টারে খবর পাঠিয়ে হোটেলে ঢুকতে ম্যানেজার শ্রীনাথ বলল, আপনার ফোন। সার্কেল ইনস্পেক্টর ভুজবল মালব্য কথা বলবেন।

অবাক হল অরিন্দম। কাল রাত প্রায় একটা পর্যন্ত ভুজবলের সঙ্গে ছিল। আজ, অথবা কাল ভুজবলকে তার যোগাযোগ করার কথা। বেলা দশটায় ভুজবল ফোন করল কেন? রিসেপশন টেবিল থেকে রিসিভার তুলে অরিন্দম বলল, অরিন্দম বলছি।

ভুজবল জিজ্ঞেস করল, কখন হোটেল ছাড়ছেন?

এখনই।

চেক ইন টাইম, বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারেন?

কেন?

দরকার আছে। আমি যাচ্ছি লাতুরে।

হাতঘড়িতে এগারটা। বারোটা বাজতে একঘণ্টা দেরি। বারোটার বদলে ভুজবল সাড়ে বারোটায় এলে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ভুজবল বলল, আপনার অসুবিধে হলে, আটকাব না। তবে থেকে গেলে খবরের রসদ পেতেন।

কী ব্যাপার বলুন তো?

জবাব এড়িয়ে গিয়ে ভুজবল বলল, লাতুর পৌঁছে ডেকান হোটেলে আপনার খোঁজ করব। আপনার ক্যামেরা, মানিব্যাগ উদ্ধার হয়েছে।

অরিন্দম কিছু বলার আগে ভুজবল রিসিভার রেখে দিল। ফাঁপরে পড়ে গেল অরিন্দম। ভুজবলের জন্যে বসে থাকলে দিনের কাজ অর্ধেক পণ্ড হয়ে যাবে। দুতিনটের বেশি গ্রাম আজ ঘোরা হবে না। মনের ভেতর থেকে কেউ বলল, থেকে যাও। ভুজবলের সঙ্গে দেখা না করে যেও না।

ধাঁধায় ফেলে দিল ভুজবল। সবচেয়ে বড়ো কথা তার ক্যামেরাটা ভুজবল নিয়ে আসবে। অনেকগুলো ভালো ছবি আছে ক্যামেরাতে। শ্রীনাথ বলল, ইনস্পেক্টরসাহেবও কবি। কবিতা লেখেন। এখানে এলে আমাকে নিজের লেখা কবিতা শোনান। শ্রীনাথের কথায় মজা পেল অরিন্দম। ঘরে ফিরে সুটকেস গুছিয়ে বারোটা পর্যন্ত থেকে যাওয়া ঠিক করল। জীবনের নতুন

কোনও হেঁয়ালি ভুজবল শোনাতে চায়, জানার আগ্রহ হল। এক-দেড়ঘণ্টা হাত গুটিয়ে বসে না থেকে কিছু কাজ এগিয়ে রাখতে চাইল। পরশুর কাগজের জন্যে একটা খবর লিখে ফেলা যায়। কিলারির সরপঞ্চ, পাডসালগির সঙ্গে গত দুপুরের কথাবার্তা, সাক্ষাৎকারের ঢঙে লিখে একঘণ্টায় শেষ করল। সাক্ষাৎকারের শিরোনাম দিল, 'আদিগন্ত মাঠে সূর্যমুখী ফুটে আছে'। লেখার মাঝখানে চা খেল এককাপ। হায়দরাবাদ ক্রনিকল দপ্তরে নাগেশ্বরকে ফোন করে পাঁচ মিনিট কথা বলল। গত রাতের ঘটনা, রাত সাড়ে তিনটেতে ডেকান হোটেলে পৌঁছনোর খবর, চেপে গেল। অরিন্দমের দেরি দেখে মজিদ খোঁজ করতে এসেছিল। সাড়ে বারোটার আগে রওনা হওয়া যাবে না শুনে মজিদ খুশি হল। গাড়িতে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারবে। ইলা অরুণের ক্যাসেট চালিয়ে নাক ডেকে ঘুমোবে। গানের সুরের সঙ্গে রক্তে ছড়িয়ে যাবে নেশার মতো আবেশ। সওয়া বারোটায় ঘরের ভেজানো দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ভুজবল। ভুজবলের পেছনে শ্রীনাথ। অরিন্দম বলল, কী সৌভাগ্য! দুই কবিকে একসঙ্গে দেখলাম।

ভুজবল হাসল। কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা এগিয়ে দিল অরিন্দমকে। তার খোয়া যাওয়া মানিব্যাগ পকেট থেকে বার করে হাতে তুলে দিল। কৃতজ্ঞ চোখে ভুজবলের দিকে তাকিয়ে থাকল অরিন্দম। খুশিতে বিগলিত শ্রীনাথ। সদ্য পাটভাঙা ইউনিফর্মে ভুজবলকে তরতাজা দেখাচ্ছে। শ্রীনাথ চলে যেতে ভুজবল বলল, চলুন।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

হাসপাতালে।

অরিন্দমকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভুজবল বলল, আবার প্রমাণ পেলাম, জীবনটা হেঁয়ালি। চলুন, নিজের চোখে দেখবেন।

প্রশ্ন না করে চেয়ার ছেড়ে অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। অস্পষ্ট কিছু আভাস পাচ্ছে। ভুজবলের সঙ্গে তার জিপে ওঠার আগে গাড়ির পেছনে কক্করকে দেখতে পেল। বিবেকানন্দ ট্রাস্ট হাসপাতালের সামনে জিপ দাঁড়াল। ভুজবল বলল, জেলার সেরা হাসপাতাল এটা।

জিপ থেকে ভুজবলের সঙ্গে অরিন্দম নামল। কক্কর আগে নেমে পড়েছে। অরিন্দমকে নিয়ে হাসপাতালের দোতলায় উঠল ভুজবল। উর্দি পরা ভুজবলকে দেখে সবাই তটস্থ। সরে দাঁড়াচ্ছে। সামনে ফিমেল ওয়ার্ড। কক্করকে বাইরে রেখে ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকল ভুজবল। পেছনে অরিন্দম। বড় ওয়ার্ড। মুখোমুখি ত্রিশটা বেড। সব ভর্তি। নানা বয়সী রোগিণীদের কয়েকজন গল্প করছিল। পুলিস দেখে কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ওয়ার্ডের শেষ-প্রান্তে গিয়ে, বিছানায় অরিন্দম যাকে দেখল, সে মুরলি। নিজের চোখদুটোকে অরিন্দম বিশ্বাস করতে পারছে না। দু'চোখ বুজে আছে মুরলি। ধীরে ওঠানামা করছে বুক। বাঁ হাতের শিরায় স্যালাইনের ছুঁচ ঢোকানো। জ্বলজ্বল করছে নাকছাবির লাল পাথর। আধখানা শরীর কম্বলে ঢাকা। পায়ে রুপোর তোড়া দুটো দেখা যাচ্ছে না। ভুজবল বলল, আপনি ঠিক বলেছিলেন। মুরলি মরেনি। আমি ভুল দেখেছিলাম। মুরলিকে দেখতে আর একজন ভুল করেনি, সে ভেঙ্কট। ওয়ার্ডের বাইরে সে বসে আছে। আপনার কি চোখে পড়েছে? মুরলির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে, আমিই তাকে আজ ভোরে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।

অরিন্দম চুপ। কথা বলতে পারছে না। ভুজবল বলল, আপনাকে বিলারিতে পৌঁছে আধঘণ্টার মধ্যে নতুন ফোর্স নিয়ে লিম্বালা ফিরেছিলাম। হ্যাঁ, যেখানে দুই বদমাশকে ঘরে আটকে রেখে গিয়েছিলাম, সেই গ্রামটার নাম লিম্বালা। লুটেরাদের মূল আড্ডা। লিম্বালায় ফিরে দেখলাম, কোনও ঝামেলা ইতিমধ্যে হয়নি। তবে মৃত মুরলির পাহারায় যে দু'জনকে রেখেছিলাম, তারা গ্রামের ভেতরে বসে আছে। দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল। একজন কৈফিয়ত দিল, সুড়ঙ্গে মুর্দার ভূত দেখেছে।

ভয় পেয়েছিল দু'জনে। কী ঘটেছে ঠিক বলতে পারছিল না। পাঁচ ব্যাটারি দুটো টর্চ জেলে, পাঁচজন সিপাই নিয়ে, সুড়ঙ্গে ঢুকে দেখি, আধখানা শাড়ির ঢাকা সরিয়ে, সেটা পরে মুরলি শুয়ে আছে। শাড়ির আর একটা টুকরো কাঁচুলির মত বুকে বাঁধা। তার শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে ভেঙ্কট। দেখে, ছানাবড়া হয়ে গেল আমার চোখ।

মুরলির পাশ থেকে ভেংকটকে সরাতে, সে গিয়ে বসল মেয়েটার মাথার কাছে। দুই পাহারাদারের মুখ থেকে শুনেসাম মুরলি উঠে বসতে তারা পালিয়েছিল। ভেংকটকে সুড়ঙ্গে ঢুকতে তারা দেখেনি।

মুরলি বিড়বিড় করে কিছু বলছে। তার কথা শোনার চেষ্টা করে একবর্ণ অরিন্দম বুঝতে পারল না। ভুজবল বলল, পত্রকারসাব, আপনার খবরে ত্রিশ হাজারের মৃত্যুর সঙ্গে একজনের বেঁচে ওঠার কাহিনী লিখে দেবেন। পড়ে সবাই খুশি হবে। আশা করবে, তার পরিবারের মৃত মানুষটা বেঁচে উঠতে পারে। ঠিক কিনা ?

অরিন্দম হাসল। বলার মত অনেক কথা মনে গজগজ করলেও বলতে পারছে না। ভুজবলের সঙ্গে ওয়ার্ডের বাইরে করিডরে এসে দাঁড়াল। এককোণে ভেংকট বসে আছে। অরিন্দমকে দেখে ভেংকট উঠে দাঁড়াল। অরিন্দম সামনে যেতে ফিসফিস করে বলল, পরের মরসুমে, খামারে সূর্যমুখী ওঠার আগে মুরলির বাচ্চাটা পৃথিবীতে এসে যাবে।

ভুজবল কাছে এসে প্রশ্ন করল, ভেংকট কী বলছে ?

মুচকি হেসে অরিন্দম বলল, বলছে, পুলিসসাহেবের উচিত ছিল দর্শনের অধ্যাপক হওয়া !

শব্দ করে ভুজবল হাসল। ডেকান হোটেলের সামনে অরিন্দমকে নামিয়ে জিপ নিয়ে ভুজবল চলে গেল। যাওয়ার আগে জীবনের নিয়মহীন নিয়ম নিয়ে দু-একটা কথা বলল। হোটেল থেকে সুটকেস গাড়িতে তুলল অরিন্দম। প্রথমে যাবে দেউড়ি। হোটেল ছেড়ে কিছুটা এগোতে ইলা অরুণের ক্যাসেট বেজে উঠল :

> 'হাতো কি এ মেহেন্দি
> হরু পিলা রং দিখায়ে
> রে মেরা সতরঙ্গী লহরিয়া রে।'

স্টিয়ারিং হুইল ধরে মজিদ বসে আছে। মন দিয়ে গান শুনছে অরিন্দম। রক্তের মধ্যে সুর ছড়িয়ে পড়ছে। ভূমিকম্প, মৃত্যু, আখ আর সূর্যমুখীর ক্ষেতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে গানের সুর। সুরের আবহে অরিন্দম ডুবে যাচ্ছে। অনুভব করছে, আজ নয়, হাজার বছর ধরে সুরে ডুবে আছে। ভূমিকম্পের রিপোর্ট করতে এসে

জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সুর খুঁজে পাচ্ছে। অনুভব করছে, ভূস্তরের কাঁপুনির সঙ্গে সুরের ইন্দ্রজাল পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরছে। ভয়ের কিছু নেই। কলকাতায় ফিরে সকলের আগে কৌশিকীকে একটা ভাল ক্যাসেটপ্লেয়ার উপহার দেবে। গান শুনবে কৌশিকী। তার গর্ভে যে রয়েছে, সে-ও শুনবে। সুরের ছোঁয়া পাবে। পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন কাঁপুনি টের পাওয়ার আগে সুরের আবরণে নিজেকে জড়িয়ে নেবে। তারপর ভূমিষ্ঠ হবে। কাল রাতে জঙ্গলের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া মুরলির চুড়ির টুকরোটা বুকপকেট থেকে বার করে চোখের সামনে অরিন্দম ধরল। টুকরো কাঁচে রোদ লেগে ঝকমিক করছে।